উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

ফেব্রুয়ারি ২০২১। মূল্য ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

করোনা উত্তর বিশ্ব রাজনীতি
সুমন ভট্টাচার্য

নতুন ধারাবাহিক
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি
প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

পাতাবাহার। অর্গানিক কেক

বাংলাদেশ ৫০
মুজিব ১০০

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

বন্ধুদের অপেক্ষায় ভালোবাসার বইঘর

প্রকাশিত হল

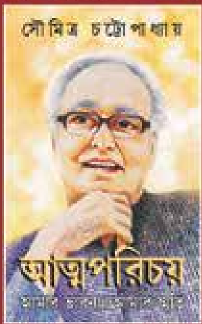

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপরিচয় 395/-

'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ কচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার

সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে

হায় সজনি

চূড়ান্ত রোমান্টিক উপন্যাস 199/-

এখনও যেসব বই বেস্টসেলার!

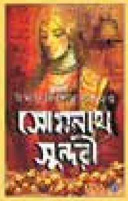

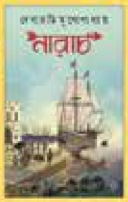

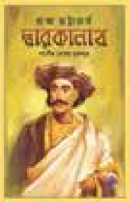

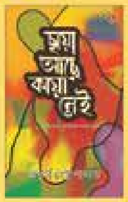

সুন্দরী সিরিজের শ্রেষ্ঠ বই! ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত **সোমনাথ সুন্দরী** 395/-

উনবিংশ শতাব্দীর মর্মস্পর্শী দলিল! অন্ধকারে আলোর মশাল

দেবারতি মুখোপাধ্যায় **নারাচ** 385/-

তিনি ছাড়া ঠাকুর পরিবার শিকড়হীন! পরাধীন দেশের রাজপুত্র

রাজা ভট্টাচার্য **দ্বারকানাথ** 349/-

তন্ত্র-অলৌকিক-অপবিজ্ঞানের গায়ে কাঁটা দেওয়া বই

অভীক সরকার **পেতবত্থু** 199/-

অন্যজগতের অতিথিদের অব্যক্ত কথা!

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় **ছায়া আছে কায়া নেই** 249/-

বইসাঁকোর নতুন বই

হুমায়ূন আহমেদ

নন্দিত নরকে 120/-

শঙ্খনীল কারাগার 135/-

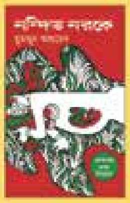

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোপন প্রেম 175/-

মৃত্যুকে আমি দেখেছি 199/-

শেষ ছোবল 160/-

ষোলোজনের কলমে ভয়াল ভূতুড়ে উপন্যাস

ভূমিকা অনীশ দেব

প্রকাশ আসন্ন

পানিঝোরা কটেজ

পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 700 009 ফোন 22411175, 9433075550

বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি

নতুন বই ও ক্যাটালগের জন্য bookspatrabharati.com

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, **হোম ডেলিভারি** ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

এখন ডুয়ার্স

সপ্তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি২০২১

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ অতনু সরখেল

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের চিঠি ২

কভার স্টোরি।
অপারেশন ক্যাকটাস লিলি ৩
এপারের চোখে মুজিব ১৫

একুশের রাজনীতি
এশিয়ার নেতৃত্বে উঠে আসবার চ্যালেঞ্জ ভারতের ২০

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি ২৮

রাজনগরের রাজনীতি
বাঘ-কংগ্রেস কোচবিহারে কংগ্রেসের অগস্ত্য যাত্রার সূচনা করেছিল ২৪

আসামের চিঠি
গুয়াহাটি বইমেলায় ঝড় তুলল বাস ড্রাইভারের উপন্যাস ৪৬

মুর্শিদাবাদ মেইল
ভগীরথপুর জমিদারির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ৩৮

এ ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?
টোটোপাড়া বারবার ৩২

পর্যটন
কেমন আছ পাহাড়? ৪০
একটি পাহাড়ি ডে আউট ৪৫

ধারাবাহিক উপন্যাস।
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৪৮

গল্প গেছো ৬১

অলৌকিক কাহিনি। রায়দের কুঞ্জকুটিরে ৫৬

আমচরিত কথা। বেনারসের আচার ৬৬

ডুয়ার্স ইত্যাদি। হরেক মাল দশ টাকা ৮০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ভারতীয় নারী। অসীমা চট্টোপাধ্যায় ৭০,
প্রবাসী কন্যার মেয়েবেলা ৭৬
পুরাণের নারী শৈব্যা ৭৮, পাতাবাহার ৮১

নয়া সাল নতুন সকাল ফিরে আসুক পাঠশালাগুলিতে

আজকাল আর কলম ধরতে ভাল লাগে না। গত দশ মাসে গৃহবন্দী ও ঘরমুখো জীবনে কলমটার বড্ড বেশি বদব্যবহার হয়ে গিয়েছে। ফুসফুসে করোনার প্রাদুর্ভাব যাদের হয় নি তাদের মস্তিষ্ক ও আঙুলের ডগাগুলি সংক্রামিত হয়েছে ফেসবুকের অতিব্যবহারে। এই ঠান্ডার দিনে পকেট থেকে বের করলেই সেই আঙুলগুলি অসাড় হয়ে আসে। নেহাৎ সম্পাদকের এই কলম লিখে দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে অনুরোধ করা যায় না চক্ষুলজ্জার খাতিরে, তাই কোনওক্রমে এই পাতা ভরাবার অপচেষ্টা পাঠক লঘু চিত্তেই গ্রহণ করবেন এই আশা রাখি।

কোভিড পরিস্থিতির মতই ফ্রন্ট ওয়ারিয়রদের (ব্যাংক-চিকিৎসা-পরিবহণ-প্রশাসন) যাদের এই শীতেও রোজ বের হতে হচ্ছে, তাদের পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয় নি। তবু ভেবে ভাল লাগে, ভাগ্যিস এই সময়টায় স্কুল খুলে যায় নি, এই প্রবল ঠান্ডার সাতসকালে বাচ্চাগুলিকে আধোঘুম চোখে পিঠে বোঝা নিয়ে বেরোতে হয় নি। ভাগ্যিস স্কুল নেই তাই শিক্ষক স্বামী বা স্ত্রীটির সৌজন্যে বিলম্বিত সকালগুলিতে বিছানায় শুয়েই দার্জিলিং চায়ের আমেজ মিলেছে রোজ। করোনায় দীর্ঘ বছরভর নিরুপায় ছুটির সৌজন্যে পথে বাজারে টুকটাক হিংসুটে কটুক্তি হজম করতে হয়েছে তাঁদের ঠিকই, তবে এই হিমেল কুয়াশায় কোল্ডক্রিমের আমেজ তার খানিক প্রশমন ঘটায় বইকি। তাই রোদচশমা চোখে চা বাগানের সেলফি না পোস্টালে সেই হিংসুপনার শোধ নেওয়া হয় কই?

আর এই শীতের আগ দিয়ে বা করোনাকালেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বলছেন, পাড়া গাঁয়ের বাচ্চারা এই লম্বা ছুটিতে এক ওই মিডডে মিল ছাড়া আর কিছু মিস করে নি, পড়াশুনা বলে তো আর কিছু নেই বহুবছর হয়ে গেল। সুতরাং স্কুল খোলা থাকলেই কী আর না থাকলেই বা কী! সত্যি কথা বলতে সরকারি শিক্ষাকে পঙ্গু করে দিয়ে রাজনীতির আখড়া বানিয়ে বেসরকারি মডেল স্কুলের বাণিজ্য জাহাজ বাংলার শিল্পহীন নিথর বন্দরে নোঙর ফেলেছিল সেই আশির দশক থেকেই, যার মান আজ অবিশ্বাস্য তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তার ফল ভোগ করছেন আজ এদেশের সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক ভাবনার পুরনো বাহকেরাই, তাঁদের তরুণ প্রজন্মেও মেধা নেই ভাবনা নেই তাই প্রতিবাদ নেই।

কেউ কেউ বলেন, উচ্চশিক্ষায় পলিটিক্স নামক একটি স্বতন্ত্র পেপার বা বিষয় ব্যাচেলর ও মাস্টার ডিগ্রিতে চালু হোক, ব্যবহারিক রাজনীতিতে এই পলিটিক্স-এ শিক্ষিতদের আলাদা কদর থাকবে। কিন্তু তার অনেক আগে নিম্ন ও বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে ব্যবহারিক পলিটিক্সকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। পড়াতে ভাল লাগে না বা পড়ানোর স্কিল কম এমন শিক্ষকদের ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া অতি প্রয়োজন। তারপর নতুন সিলেবাস নতুন প্রশিক্ষণ নতুন শিক্ষক নতুন শিক্ষণ মাধ্যম সব মিলে শিক্ষাব্যবস্থায় বয়ে আনবে সতেজ বাতাস। এক শিশু তার কৈশোরে গর্ব বোধ করবে মহাত্মাদের নিয়ে, চোখের জল ফেলবে শহীদদের জন্য, নদী ফুল গাছ পাখি জঙ্গল ও পাশের বাড়ির সবার জন্য ভাববে। তেমনই একটি সিলেবাস চালু করা কি খুব কঠিন কাজ?

সত্যি, সবাই ভীষণ অপেক্ষায় আছি এমন একটি অবিশ্বাস্য সকাল আমাদের বাড়ির ছোটগুলিকে উপহার কবে দেব আমরা!

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

অপারেশন ক্যাকটাস লিলি

একাত্তরের যুদ্ধজয়ে ভারতীয় ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের উত্তরবঙ্গে অভিযান কাহিনি

Indian Army After Independence নামক গ্রন্থ সূত্রে মেজর কে.সি. প্রবাল একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সেটির নাম 1971: Making Bangladesh a reality - II. ওই নিবন্ধটির বাংলায় ভাবানুবাদ করেছেন উমেশ শর্মা

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ-১৯৭১ (পূর্বাঞ্চল)
৬ নং মাউন্টেন ডিভিশনাল সিগনাল রেজিমেন্ট

স্থানটির নাম বেরিলি। উত্তরপ্রদেশের একটি সেনাছাউনি। সেখানে ৬নং মাউন্টেন ডিভিশনাল সিগনাল রেজিমেন্ট নামক ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনা ছাউনি। নতুন কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল যতীন্দ্র প্রতাপ সেখানে ওই বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে এসেছিলেন।

তবে মজার ঘটনা হল, তাঁর পূর্বসূরী লেঃ কর্ণেল পি.এল. কোহলি নবাগতের আগমনের পূর্বেই ওই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পদাধিকারি অর্থাৎ সেকেন্ড ইন-কমান্ড মেজর সি.এম. সাগনে তখন সেনা ছাউনিতে ছিলেন না। একটা কোর্স করতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। তাহলে লেঃ কর্ণেল যতীন্দ্র প্রতাপ কার কাছ থেকে বাহিনীর দায়িত্ব নেবেন?

সেনা ছাউনিতে তখন ছিলেন ফিল্ড অফিসার কে.ভি. সুরি (১ম কোম্পানি) এবং দ্বিতীয় কোম্পানির প্রধান মেজর এস. কে. চ্যাটার্জি। ব্রিগেড সিগনাল কোম্পানির দায়িত্বে ছিলেন মেজর আর.এস. সিং (৯নং মাউন্টেন ব্রিগেড), মেজর এ.ভি. জোগলেকার (৬৯ মাউন্টেন ব্রিগেড) এবং মেজর এইচ.এল. ব্যানার্জি (৯৯ মাউন্টেন ব্রিগেড)। এঁরা সবাই পদমর্যাদায় হবেন তাঁরই অধীনে। তাই ১৯৭১ সালের ১২ আগস্টে ওই রেজিমেন্টে লেঃ কর্ণেল যতীন্দ্র প্রতাপের কর্মে যোগদানে কোনও আনুষ্ঠানিক রীতিই মানা হয় নি।

আরও মজার ঘটনা হল, তিনি কাজে যোগ দিয়েই জানতে পারলেন যে, দু'দিন আগে অর্থাৎ ১০ আগস্ট ওই ইউনিটটিকে 'অপারেশন ক্যাকটাস লিলি' এই নামে চিহ্নিত করে জলপাইগুড়ি জেলার (পঃবঃ) বিন্নাগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেবার নির্দেশ এসেছিল। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি ২০ আগস্টে সেনাদলের একটি অগ্রিম বাহিনী বেরিলি থেকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই অগ্রগামী বাহিনী ২৪ আগস্ট বিন্নাগুড়িতে পৌঁছেও যায়। ২০নং মাউন্টেন ডিভিশনাল সিগনাল রেজিমেন্টের তত্ত্বাবধানে ওই ইউনিটটি সেখানে কেন্দ্রিভূত এলাকায় একত্রিত হয়েছিল।

বাকি সেনারাও দুটি উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে সেখানে পৌঁছেছিল। প্রথম দলটি কমান্ড অফিসারের নেতৃত্বে ৩১ আগস্ট এবং দ্বিতীয় দলটি মেজর কে.ভি. সুরির নেতৃত্বে ৭ সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জে.পি. পান্ডের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধান

বিষয়ে দায়িত্বে থাকা দলটিও সেখানে সামিল হয়েছিল।

৬নং মাউন্টেন ডিভিশনের সেনাদের বলা হয়েছিল যে, দলটি যেন অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বেতার সম্প্রচারিত নির্দেশ অনুসারে তিব্বত সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করে এবং ৬৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডের সিগন্যাল কোম্পানির গতি যেন ধীর গতিতে হয়।

বিন্নাগুড়িতে পৌঁছে ওই ইউনিটটি (অপারেশন ক্যাকটাস লিলি) যুদ্ধকৌশল অনুসারে পুনরায় নতুন নামে চিহ্নিত হয়। নাম হয় ১৩ তত্ত্বাবধায়ক ২০নং ডিভিশন। ওই দলটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলা বিষয়ে যেন দ্বিতীয় কোনও নির্দেশ প্রকাশ না করে এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনও বিশেষ আর্থিক দাবি যেন না জানায়। ফলে ওই দলটি যেমন রণাঙ্গনে যেতেও পারল না, তেমনই প্রায় দু'মাস বেতনও পায় নি। সময়ান্তরে দেখা গেল, যে যুক্তিতে এই গোপন দলটি গড়ে তোলা হয়েছিল, তা কোনও ফলই প্রদান করতে পারে নি। মাসখানেকের মধ্যে যখন তারা রণাঙ্গনে যাত্রা শুরু করল, তখন পাকিস্তান রেডিও কিন্তু তাদের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানের বিষয়টি প্রকাশ করে প্রচার করে ফেলেছিল।

সমস্ত বাহিনীর সমাবেশ সম্পূর্ণ হলে, কমান্ডিং অফিসার পশ্চিম ভুটানে সামরিক উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য ও সাংকেতিক সংযোগ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তেমন কোনও স্থানে ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। মাসখানেকের মধ্যে লেঃ জি.কে. সয়াল বিন্নাগুড়ি/হাসিমারা, চেমাকোটি, থিমপু/পারা, দুখিজং স্থানে রেডিও রিলে কেন্দ্র গড়ে তোলেন। গোটা বাহিনী পরবর্তী নির্দেশের প্রত্যাশায় বিন্নাগুড়িতেই থাকল। কিন্তু ৬নং মাউন্টেন ডিভিশনকে ৯৯নং ব্রিগেড বাদে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ সীমান্তে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জলপাইগুড়িতে যাবার নির্দেশ ইতোমধ্যে এসে যায়। ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডক দুটি পদাতিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। দলটির দায়িত্ব প্রদান করা হয় ২০নং মাউন্টেন ডিভিশনের উপর এবং তাদেরকে ভজনপুর-পচাগড়ে (পূর্ব পাকিস্তান) স্থাপন করা হয়।

৮ নভেম্বর ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেড, সিগন্যাল কোম্পানির সেনাদের নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে দিনহাটা অভিমুখে রওনা দিয়েছিল। রেডিও সংযোগ স্থাপনের জন্য ডি-১ ও ডি-২ অন্তর্জালে আবদ্ধ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ভাবে কোচবিহারের পোস্টাল ও টেলিগ্রাফ বিভাগের একটি সংযোগ সূত্র দিনহাটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পরবর্তী দুদিন ধরে ৬নং পার্বত্য গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্রিগেড কোচবিহারে এসে পৌঁছায় এবং যুদ্ধকৌশলী ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার সাহেবগঞ্জের (দিনহাটার পরবর্তী) দিকে যাত্রা শুরু করে। দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জের মধ্যে যোগাযোগের জন্য কেবল লাইন পাতা হয়। ১৩ নভেম্বর যুদ্ধ কৌশলী বিধ্বংসী বাহিনী হেডকোয়ার্টার ডিভিশনের দলটি দিনহাটায় হাজির হয়।

৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডটি যখন দিনহাটা রওনা দেবে, ওই মুহূর্তে কমান্ডিং অফিসার বিভাগীয় কমান্ডারের উপর কোচবিহারে তাঁর হেডকোয়ার্টার করবার জন্য একটা চাপ সৃষ্টি করছিলেন। আসলে বিভাগীয় কমান্ডারের প্রাথমিক ভাবে ভুটানে সৈন্য ছাউনি স্থাপনের দিকে বেশি নজর ছিল, তাই সেনা হেড কোয়ার্টার ওই অনুমতি প্রদান করেন নি। বিভাগীয় কমান্ডার সহায়তাকারী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারকে এবং বিধ্বংসী বাহিনীকে দিনহাটায় ঘাঁটি গাড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংযোগকারী বিভাগে লেঃ এ.জে.এস বক্সির অধীনে দশজন সেনা ও তিনটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেবা অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ১৩ থেকে ২৫ নভেম্বর দিনহাটাতেই ছিল। ৯নং ব্রিগেড সেখানে এলে যোগাযোগ রক্ষাকারী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে এদের সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ৯নং ব্রিগেডের যোগাযোগকারী কেবল লাইনপাতা হয়েছিল কোচবিহার সেনাছাউনির মধ্যস্থতায় এবং যুদ্ধকৌশলী সেনাদলের ডি-১ এবং ডি-২ রেডিও সংযোগকারী আন্তর্জালের মাধ্যমে।

যদিও বিন্নাগুড়ি-কোচবিহার এবং কোচবিহার-দিনহাটা একমাত্র যোগাযোগকারী সড়কপথ, তবুও ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ঘাঁটিগুলির সংযোগ ওই সড়কপথই ছিল একমাত্র বাঁচনদড়ি।

বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট সেনা ঘাঁটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ক্যাপ্টেন জি.কে. সয়ালের নেতৃত্বে তিনজন সেনার একটি দলকে ব্যবহারের জন্য ফালাকাটায় একটি গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন কাঞ্জিলালের জন্য কোচবিহারে একটি গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল। হেড কোয়ার্টারের 'এ' সেক্টরের সঙ্গেও ওই গাড়ি দুটি যোগাযোগ রাখবে। দিনহাটাতে একই উদ্দেশে সেকেন্ড লেফটেনান্ট এ.কে. বাট্টার অধীনে জেসিও এবং সাতজন সেনা আধিকারিকের জন্য দুটি গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল। ওই প্রথা বহির্ভূত ও আপাতদৃষ্টিতে আর্থিকদায়ভার চাপানো পদ্ধতি যে কোনও মূল্যে সব সার্কিটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যই করা হয়েছিল।

বিন্নাগুড়ি ও কোচবিহারের প্রধান ঘাঁটির মধ্যে আদেশ-নির্দেশ আদান প্রদানের সুবিধার জন্য ১এ বার্তাবিনিময় টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডের সঙ্গে ঘাঁটিগুলির যোগাযোগের জন্য দিনহাটা, গিতালদহ ও বামনহাটে এ জোড়া পি.এল. ১৫ নভেম্বর ভাড়া করা হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পেলে ফালাকাটায় ক্যাপ্টেন সয়ালের অধীনে থাকা ঘাঁটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছিল।

কয়েকদিনের মধ্যে জলপাইগুড়িতে থাকা ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডকে সাহায্য করার জন্য ৬নং মাউন্টেন গোলন্দাজ বাহিনীটিকে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছিল। আবার কয়েকদিন পরে ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারকে পাঠানো হয়েছিল চৌধুরীহাটে। দিনহাটা, গীতালদহ ও বামনহাটের নতুন ঘাঁটিগুলিতেও সংযোগকারী পি.এল.-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২৪ নভেম্বরে এই ডিভিশনের অধীনে ১২ গাড়োয়াল রাইফেল বাহিনীকে সংযুক্ত করা হয়। ওই ইউনিটটিকে বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির সঙ্গে যতদিন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি, ততদিন টেলি যোগাযোগের সুবিধা প্রদান করা যায়নি। একমাত্র আর.এস.সি.-১১/আর ২১০ নামক রেডিও সংযোগকারী ব্যবস্থা এই ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে ওই যোগাযোগ ব্যবস্থা করবে বিচ্ছিন্ন রেডিও স্টেশন কিন্তু ৬-১ আন্তর্জালের সঙ্গে থাকবে সেটির সংযোগ।

২৫ নভেম্বর বিধ্বংসী দলের একাংশ দিনহাটা থেকে হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসে এবং এক সপ্তাহ পরে হেডকোয়ার্টার থেকে ৯নং ব্রিগেড জয়মনিরহাটে পৌঁছায় কিন্তু ৬নং মাউন্টেন গোলন্দাজ বাহিনী বিন্নাগুড়িতে ফিরে আসে। ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টর থেকে কোনও লিখিত নির্দেশ না পৌঁছালেও ওই ইউনিটটি ধীরে ধীরে 'ক্যাকটাস লিলি' নামে চিহ্নিতকরণ হয়ে কর্মকান্ড শুরু করে দেয়। ১ ডিসেম্বর বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের প্রধান শাখাটি জলপাইগুড়ি

সমস্ত বাহিনীর সমাবেশ সম্পূর্ণ হলে, কমান্ডিং অফিসার পশ্চিম ভুটানে সামরিক উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য ও সাংকেতিক সংযোগ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তেমন কোনও স্থানে ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। গোটা বাহিনী পরবর্তী নির্দেশের প্রত্যাশায় বিন্নাগুড়িতেই থাকল। কিন্তু ৬নং মাউন্টেন ডিভিশনকে ৯৯নং ব্রিগেড বাদে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ সীমান্তে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জলপাইগুড়িতে যাবার নির্দেশ ইতোমধ্যে এসে যায়।

অভিমুখে রওনা দেয়। ওই দলে ছিল গোলন্দাজ বাহিনী দলটিও। ২ ডিসেম্বরে ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেডকে এদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং বিচ্ছিন্ন রেডিও ডি-১ এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

খুব দ্রুত খবরাদি আদান প্রদানের জন্য ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডকে হেডকোয়ার্টারের ৩৩নং সেনাদলের ডি-১৫ আন্তর্জালি লাইনের রেডিও ধারা পুনঃসম্প্রচারে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। আর্থিক ও লোকবল সাশ্রয়ের জন্য হেডকোয়ার্টার ৩৩ বাহিনীর

সঙ্গে অন্যান্য সার্কিটের রেডিও ধারা পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেড ডি-১৫ আন্তর্জালি রেডিও ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তারা ডি-২ নামক আন্তর্জালে আসতে না পারলেও যাবতীয় যাতায়ত ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ডি-১ আন্তর্জাল সম্পন্ন করবার ক্ষমতা লাভ করে।

এগিয়ে চলেছে ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেড। পেছনে পেছনে সিগন্যাল জোনের সেনারা তামা, দস্তার পিভিসির তার দিয়ে এক জোড়া করে ৭০ এলবিএস তার পেতে চলেছে। কিন্তু ব্রিগেডের চলন্ত গতির সঙ্গে তাদের পক্ষে তাল বজায় রাখা কঠিন। তাছাড়া ওই অপারেশনে লাইন পাতার দক্ষ অর্থাৎ কৌশলী সেনাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপনকারীদের কাজের মধ্যে কিছুটা সমতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, কৌশলী ও দক্ষ সেনারা যতটা সম্ভব দ্রুত কাজটি সমাধা করতে চায়, আবার সংযোগকারী সেনারাও অগ্রগামী সেনাদের নজরের বাইরে হারিয়ে ফেলতে রাজি নয়।

কিন্তু ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেড এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কর্ণেল প্রতাপ চেয়েছিলেন, ব্রিগেডটি যতটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলুক। কারণ যত তাড়াতাড়ি তারা নীলফামারিতে পৌঁছতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি সৈয়দপুর জলপাইগুড়ি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সড়কের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ বিষয়টি মনে থাকায় তিনি লেঃ এ.কে. বাট্টাকে চলমান বাহিনীর পাশ দিয়ে একই রাস্তায় এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ৭১নং ব্রিগেড আন্তর্জাতিক সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেজর এস.কে. চ্যাটার্জি ছিলেন ২নং কোম্পানির আধিকারিক। তিনি ব্রিগেডটি পৌঁছানোর আগেই সৈয়দপুরে পৌঁছে ওই শহরের পরিচালনের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে, ব্রিগেডটি সৈয়দপুরের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রে উপস্থিত হলেই, বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

এই অভিযানের সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেজর জেনারেল যতি প্রতাপ কিছু মজাদার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। একবার তিনি হলদিবাড়ি হয়ে সৈয়দপুরে গিয়েছিলেন। অনেক রাতে তিনি জলপাইগুড়িতে ফিরছিলেন। তিনি একটি পাকা রাস্তা ধরেই হলদিবাড়ি ফিরছিলেন নিশ্চিন্তমনে। কিছুদূর এসে তিনি এমন একটা পথে এসে হাজির হলেন যে পথটি ধীরে ধীরে সরু হয়ে এসে এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হল, যেখান থেকে আর এগিয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। তিনি থামলেন। পেছনে তাকালেন। দেখলেন কমপক্ষে দশখানি ট্যাক্সি ও মোটরগাড়ি তাকে অনুসরণ করে সেখানে এসে হাজির হয়েছে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি পৌঁছানো ট্যাক্সির ড্রাইভারকে হলদিবাড়ি যাবার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায় তিনি হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন, ড্রাইভারের উত্তরটি ছিল, ‘সাহিব, আমরা ভেবেছিলাম, আপনি ফৌজি আদমি, আপনি রাস্তা চেনেন। হাতে ম্যাপ আছে আপনার। আমরা তো তাই আপনাকে অনুসরণ করছিলাম মাত্র’। ভেড়ার পালের মত শুধু অনুসরণ করে চলেছিলেন তারা।

বহু কষ্টে সেখান থেকে বেরিয়ে সঠিক পথের সন্ধান করে তিনি শেষ পর্যন্ত হলদিবাড়ি এসে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হলে, অগ্রগামী ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ প্রধানত ঘটত রেডিও মাধ্যমে। কোনও এক প্রভাতি মুহূর্তে রেডিওর ডি-১ কন্ট্রোল অপারেটর তার প্রতি বর্ষিত কিছু পাঞ্জাবি গালাগাল শুনতে পেলেন। আপাত দৃষ্টিতে একটি পশ্চিম পাকিস্তান রেডিও অপারেটর খুব মৃদু, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যুদ্ধযাত্রার বিষয় প্রচার করেছিল। এ ঘটনাটি লেঃ ডি.ভি. পন্থবৈদ্যকে জানালে তিনি একজন শিখ অপারেটরকে ওই সম্প্রচারিত রেডিও স্টেশনটিকে করায়ত্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর অমার্জিত গালিগালাজের যেন খেলা শুরু হল। শিগগিরই দু’পক্ষই বুঝতে পারল যে, বিশ্রাম দরকার। তখনই ওই পক্ষ যেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঝুলে আছে, এমন এক ভাব দেখিয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করে এবং ভিন্ন পথ ধরতে চায়। কমান্ডিং অফিসার এ বিষয়ে খুব একটা চিন্তান্বিত না হলেও, একদিন ডি-১ রেডিও কন্ট্রোল স্টেশনের একজন অপারেটরকে বলতে

শুনল— 'ওয়ে মেরা স্প্যারো, মেরে পিছে খলোতা হ্যায়, ওহ্ নু জান দে, ফের মে তায়নু ওয়েখাঙ্গা। খোটে দা পুত্তর' (বঙ্গানুবাদ— আমার চড়ুইটি (ঘুঘু) আমার পেছনে লেগেছে। তাকে লাগতে দাও। কিন্তু, ওরে গাধার বেটা, আমি তখন তোকে দেখে নেব।) পরবর্তী কালে ওরা যখন যুদ্ধ বিজয়ের পর সৈয়দপুরের পাকিস্তানি ব্রিগেডের বন্দিকৃত শত্রুসেনাদের শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিল, তখন সেই পাকিস্তানি রেডিও অপারেটরটিকে চিহ্নিত করা হয়। তারপর দুজনে হ্যান্ডশেক করে কোলাকুলি করতে করতে হাসতে থাকে। দুজনই দুজনকে ক্ষমা করে দেয়।

সিগনাল রেজিমেন্টের বাম বলয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা

১৯৬৪ সালের ১৫ এপ্রিলে শিলিগুড়িতে এই ইউনিটটি গড়ে তোলা হয়েছিল। ইউনিটটির প্রধান কাজ ছিল সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ৩৩নং সেনাবাহিনীর জন্য ঘাঁটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা। এমনকি উত্তর সিকিমের দুর্গম ঘাঁটিগুলি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও ছিল ওই ইউনিটের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে দার্জিলিংয়ের কাছে লেবং-এ ওই বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। দায়িত্বে ছিলেন লেঃ কর্ণেল এস.সি. রায়। তাঁর সহায়ক ছিলেন সেকেন্ড কমান্ড অফিসার মেজর পি.কে.এস. বিশেন। অন্যান্য পদাধিকারী নিযুক্ত ছিলেন মেজর ভি.কে. বাজাজ (অ্যাডজুটান্ট), মেজর এ.এস.মোলনি (২নং কোম্পানি) মেজর ভি.কে. গুপ্ত (৩নং কোম্পানি), ক্যাপ্টেন এস.সি. শর্মা (১নং কোম্পানি) এবং ক্যাপ্টেন কে.এস. নায়ার (হেডকোয়ার্টার কোম্পানি)।

সেনাবাহিনীর বাম অংশ যদিও শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখাশোনা, পর্যালোচনার কাজে একান্ত ভাবে নিয়োজিত, এই অংশ কিন্তু পাকিস্তানকে আক্রমণ বা যুদ্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। ৩৩নং সেনাবাহিনীর সেক্টরে শুধুমাত্র তাদের দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর অগ্রগমনের পথের বাধাবিঘ্ন দূর করা। সেজন্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেডিও ব্যবস্থার সঙ্গে সব ঘাঁটিকে সংযুক্ত করা, স্থানীয় সিগন্যাল ব্যবস্থা যাচাই এবং প্রয়োজন হলে ঝটিতি তা পরিবর্তন করা। ৩৩নং সেনা সেক্টরের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বজায় রাখাই ছিল প্রধান কাজ। এছাড়াও স্থানীয় ভাবে সিগন্যাল সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছিল গ্যাংটক, কালিম্পং, হাসিমারাতে। তাছাড়া এ বিষয়ে এক্সচেঞ্জ অফিস খোলা হয়েছিল ব্যাংডুবি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, সেবক রোড ও বিন্নাগুড়িতে। আর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সুচারুভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গোটা ইউনিটটাকেই পুনর্গঠন, পুনর্সজ্জিত করা হয়েছিল। ৩৩নং সেনা সেক্টরের যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ১ কোম্পানি সেনার উপর। ওই কোম্পানির অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল ২০নং মাউন্টেন ডিভিশন ও নর্থবেঙ্গল সাব এরিয়ার পোস্টাল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার উপর। ১৭নং ও ২৭নং মাউন্টেন সেক্টরে অনুরূপ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল দুই কোম্পানি সেনার উপর। এভাবে সমস্ত ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করে কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ২০ অক্টোবর।

> এগিয়ে চলেছে ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেড। পেছনে পেছনে সিগন্যাল জোনের সেনারা তামা, দস্তার পিভিসির তার দিয়ে এক জোড়া করে ৭০ এলবিএস তার পেতে চলেছে। কিন্তু ব্রিগেডের চলন্ত গতির সঙ্গে তাদের পক্ষে তাল বজায় রাখা কঠিন। তাছাড়া ওই অপারেশনে লাইন পাতার দক্ষ অর্থাৎ কৌশলী সেনাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপনকারীদের কাজের মধ্যে কিছুটা সমতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ৪২নং লঘু বেতার তরঙ্গ (৮ সেট মোবাইল) ৪নং সিগনাল সেনা রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ৩ নভেম্বর সিগনাল বাহিনীর দু'কোম্পানি সেনা কালিম্পং-এ পাঠানো হয়েছিল। নভেম্বরের শেষ দিকে হেডকোয়ার্টার কোম্পানি ও রেজিমেন্টাল

হেডকোয়ার্টার কোম্পানি শিলিগুড়ির সন্নিকটে ব্যাংডুবিতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আগে থেকেই এক কোম্পানি সেনা মজুত ছিল। আন্তর্জাতিক সড়ক পথরেখা ধরে জলপাইগুড়ি-চ্যাংড়াবান্ধা-পাটগ্রাম -বাউড়া-বড়খাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন করে সোজসুজি ৩৩নং হেডকোয়ার্টার ও গাড়োয়াল রাইফেলসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। জলপাইগুড়ি থেকে বড়খাতার ওই সংযোগ রেখার দূরত্ব ছিল ৬৭ কিলোমিটার। ২ ডিসেম্বর ওই ইউনিটকে বেতার তরঙ্গের সঙ্গে ব্যাঙডুবির উত্তর ও পশ্চিম সেনা ছাউনির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত বেতার তরঙ্গের সংযুক্তি ঘটেছিল।

পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ‘অপারেশন ক্যাকটাস লিলি’র ওই ইউনিটটির কোনও প্রধান ভূমিকা ছিল না। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সেটির উপর বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব এসে বর্তায়। ৩ ডিসেম্বর ৭৭নং পথ নির্মাণ ও সিগন্যাল ব্যবস্থার সমস্তরকম নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতাও অর্পিত হয়। ৪ ডিসেম্বর একজন আধিকারিক, একজন জেসিও-ও ২২ জন অফিসারের উপর পচাগড়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ওই বিচ্ছিন্ন ইউনিটকে ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেডের জন্য সংযোগব্যবস্থা উন্নয়নের ভার দেওয়া হয়। এই ইউনিটটি পচাগড়, বীরগঞ্জ ও সৈয়দপুরের সংযোগ ব্যবস্থার দেখভাল করবে। ৭ ডিসেম্বরে এ ইউনিটকে পচাগড় থেকে ঠাকুরগাঁওয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। আবার সাতজন আধিকারিককে সেবক রোডের ছাউনিতে মোতায়েন করা হয়। ওই অফিসারেরা সুকনা ও তেঁতুলিয়ার মধ্যেকার সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলবেন।

৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেডের গতিধারা বীরগঞ্জ পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার ফলস্বরূপ, ৯ ডিসেম্বর বীরগঞ্জের পুরনো যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ৭৭নং সড়ক নির্মাণ বিভাগটিকে যে ইউনিটের সঙ্গে ৩ ডিসেম্বর যোগ করা হয়েছিল, তা ১২ ডিসেম্বর বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ৩৩নং সেনাবাহিনীর সিগনাল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেড খানসামা, দারোয়ানি অভিমুখে রওনা দিয়ে সৈয়দপুরে এসে হাজির হয়। মাটিতে কেবল লাইন পেতে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু পি.এল.রুটটি আন্তর্জাতিক পথ ধরে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি-ডোমার-নীলফামারি-সৈয়দপুর পর্যন্ত প্রসারিত, তাই ১৩ ডিসেম্বর ওই পথটি সংস্কার ও আধুনিক করে সামরিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। একজন আধিকারিক, একজন জেসিও এবং ২১ জন অফিসারকে এ কাজের জন্য জলপাইগুড়িতে নিযুক্ত করা হয়। জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্তও সংযোগ লাইন পাতা হয়। ১৫ ডিসেম্বরে একজন জেসিও ও আটজন লাইনম্যানকে সেবক রোডে নিয়োজিত করা হয়। ওদের কাজ ছিল সুকনা-পচাগড় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কেবললাইন পাতার কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেগুলো হল জলপাইগুড়ি-ডোমার-সৈয়দপুর, সুকনা -ঠাকুরগাঁও-বীরগঞ্জ-সৈয়দপুর, সৈয়দপুর-রামপুর এবং সৈয়দপুর-ডিয়াপার। ‘অপারেশন ক্যাকটাস লিলি’র নাম বাতিল করে বাম দিকের জোন সিগন্যাল রেজিমেন্টের নাম নতুনভাবে করা হয়েছিল বাংলাদেশে। অবশ্য সেটা এক মাস পরের ঘটনা। তাদের উপর বাংলাদেশের যাবতীয় আকাশবাণীর অর্থাৎ বেতার তরঙ্গ ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। অবশ্য গোটা ইউনিটটা এ কাজে নিযুক্ত ছিল না। ইউনিটের যে অংশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, সেটিকে অন্যান্য সিগনাল ইউনিটের সঙ্গে সহযোগিতা করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ইউনিটটি লেবং-এ ফিরে আসে।

৩৩ নং সেনাবাহিনী (সমরাঙ্গনে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)

৩৩নং সেনাবাহিনীর শুধুমাত্র একটি অংশই পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ওই সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন লেঃ জেনারেল থাপা। উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং

১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে ২৬নং ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন। কোনও পদ্ধতি নিরূপণে তার আচরণ ছিল কঠিনতর। এটা ছিল সকলেরই জানা। সেপ্টেম্বরের দিকে জেনারেল অরোরার পরামর্শ ছিল যে, থাপা যেন চিফ অব স্টাফ হিসেবে ওই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সমরাঙ্গন পরিচালনা করেন। তাহলে সেনাবাহিনীর প্রধান কমান্ডার হিসেবে তিনি সীমান্ত অঞ্চলে তার সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু লেঃ জেনারেল থাপা ওই প্রস্তাবে রাজী হন নি।

হয়তো ওই পরামর্শটি সঠিকও ছিল না। যুযুৎসু সেনাবাহিনীকে শুধু সীমান্তে নিষ্ক্রিয় রাখতে কোনও কমান্ডারই চাইবেন না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা তরাই অঞ্চলটি অনেকটাই শুষ্ক। আর এ কারণেই ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশই এ অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি সংখ্যক সেনা নিয়োগের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই সেক্টরকে রেলপথে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মাধ্যমে দক্ষিণের যশোর-ঝিনাইদা এলাকার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সড়কপথ উত্তরবঙ্গের বহু শহরাঞ্চলকে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহী, পাবনার সঙ্গে অনেক সড়ক শাখা-প্রশাখা নিয়ে রংপুর, বগুড়া, নাটোর ইত্যাদি শহরের সঙ্গে যুক্ত। এই সেক্টরে সবচেয়ে বড় নদী হল তিস্তা। নদীটি উত্তর-পশ্চিম এলাকা দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব পথ পরিক্রমা করে চিলমারিতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র কামানবাহিনী এই সেক্টরে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১৬নং ডিভিশনের ও অন্যান্য অ্যাডহক অশ্বারোহী সেনাবাহিনী এ সেক্টরে রাখা হয়েছিল।

এই সেক্টরে উত্তরাঞ্চলে শত্রুপক্ষের অঙ্গুলি নির্দেশ শিলিগুড়ি করিডোর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমাঞ্চল কিন্তু মধ্যভাগে বাঁকের মত স্থানে অবস্থিত। উত্তরাংশে ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের উপদ্রব বেশি কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে ওই বাঁকের মত স্থানে লড়াইয়ের সুবিধা বেশি। ফলে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালানোর সুবিধা বেশি। ওই গুহার মত বাঁকে বালুরঘাট নামক ভারতীয় শহরে ২০নং পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিংহের হেডকোয়ার্টার।

পাকিস্তানের ১৬নং পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল নজর হুসেইন শাহ্ ওই সেক্টরকে রক্ষা করার দায়িত্বে ছিলেন। তার হেড কোয়ার্টার ছিল বগুড়ায়। তার তিনটি নিয়মিত সেনার একটি ব্রিগেড উত্তরে রংপুর হেডকোয়ার্টারে ছিল অবস্থিত। দ্বিতীয় ব্রিগেডটির হেডকোয়ার্টার ছিল বগুড়ায় এবং তৃতীয় ব্রিগেডটি নিয়োজিত ছিল দক্ষিণের নাটোরে। আর যে অ্যাডহক ব্রিগেডটি ঘাঁটি গেড়েছিল রাজশাহীতে। একমাত্র কামানবাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, পাকিস্তানের ওই বাহিনীও এই সেক্টরে ছিল। ওই বাহিনীতে ছিল চার স্কোয়াড্রন সৈন্য। তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করছিল ১৬নং ডিভিশনের নিয়মিত ও অ্যাডহক ব্রিগেডের সৈন্যরা।

১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কেবললাইন পাতার কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। 'অপারেশন ক্যাকটাস লিলি'র নাম বাতিল করে বাম দিকের জোন সিগন্যাল রেজিমেন্টের নাম নতুনভাবে করা হয়েছিল বাংলাদেশে। অবশ্য সেটা এক মাস পরের ঘটনা। তাদের উপর বাংলাদেশের যাবতীয় আকাশবাণীর অর্থাৎ বেতার তরঙ্গ ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই সেক্টরের উত্তরাঞ্চল ও

৩৩নং সেনাবাহিনীর অধীনে ছিল। সেটিকে পরিচালনা করতেন ৭১নং মাউন্টেন ব্রিগেডের (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল) পি.এন. কাথপালিয়া। অব্যবহিত পরে ওই ব্রিগেডটি ৬নং ডিভিশনের মেজর জেনারেল পি.সি. রেড্ডি এবং ৯নং মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার তীর্থ ভার্মার ও কিছু মুক্তিবাহিনীর অধীনে পরিচালিত হত। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ওই দুটি ব্রিগেড, পাকিস্তানি সেনাদের আধিপত্য যুক্ত এলাকাগুলিতে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কৌশলে সৈন্য পরিচালনা ও সুদক্ষ সেনাদের সাহায্যে কব্জা করতে থাকে। ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে পচাগড়, পতিরাম এবং ভুরুঙ্গামারি দখলে চলে এসেছিল। দেখা যায়, ৭১নং ব্রিগেড ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও এবং ৯নং ব্রিগেডটি কুড়িগ্রাম পৌঁছে গিয়েছিল। কঠিন লড়াই চলেছিল বালুরঘাটের পূর্ব দিকে হিলি নামক স্থানে। হিলি শহরটির অবস্থান কলকাতা-শিলিগুড়ির প্রাচীন রেলপথে। দেশভাগের আগে ওই জনপদ কোলাহলমুখর ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল।

র‍্যাডক্লিফ সাহেব যখন সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করেছিলেন, তখন রেলওয়ে স্টেশনটি চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু শহরটি থাকে ভারতের অন্তর্গত। ওই জনপদের পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত জনবিরল ও বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট গ্রামগুলিকে পাকিস্তানি সেনারা দুর্গের মত গড়ে তুলেছিল এবং ৪নং সীমান্তবাহিনীর পদাতিক সেনাদের দিয়ে ভারতীয় দুর্গ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল।

হিলির অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় সেনারা অতি সহজেই বালুরঘাটের ছড়ানো ছিটানো স্ফীত এলাকা দিয়ে হিলিতে প্রবেশ করে পাকিস্তানি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে পারে। পাকিস্তানি বাহিনী মে মাস থেকেই হিলিতে ছিল বেশ সক্রিয়। ১ নভেম্বর ওরা ভারতের ভেতরে বালুরঘাট এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল। এর ফলে জেনারেল অরোরা হিলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য শত্রুপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেঃ জেনারেল থাপা সেভাবে আক্রমণ করার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ওই বাধা ধোপে টেঁকেনি।

যুদ্ধ শুরু হল। রণাঙ্গন বালুরঘাট। এই সমরাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ২০২নং মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার এফ.পি. ভাট্টি। ২২-২৩ এর মধ্য রাত্রিতে ৮নং গার্ড বাহিনীকে আঘাত হানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং ৫নং গাড়োয়াল বাহিনীকে রিজার্ভে রাখা হয়েছিল। তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল মাউন্টেন রেজিমেন্টের দুটি বাহিনী, একটি হালকা গোলন্দাজ বাহিনী এবং এক ব্যাটারিরও কমের একটি মাঝারি সেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে ছিল ৬৩নং অশ্বারোহী (টি ৫৫ ট্যাঙ্ক) বাহিনী।

প্রথমে শত্রুপক্ষীয় দুর্গকে কব্জা করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, পরবর্তী লক্ষ্য মোরাপাড়া গ্রামের ঘাঁটি। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই চালিয়ে গেল। রাতে তো শুরু হয়েছিল ভয়ঙ্কর লড়াই এবং পাকিস্তানি সেনারা মোরাপাড়া ঘাঁটিটির দখল বজায় রাখতে সফল হয়েছিল। ভারতীয় গার্ড বাহিনী সামান্য একটা অংশ দখল করতে সফল হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর পেছনে থাকা সহায়ক ৫নং গাড়োয়াল বাহিনীকে যে জায়গা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী মূল লড়াইটা সংগঠিত করছিল, ওই জায়গায় আঘাত হানার নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার ভাট্টি। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে ওই ব্যাটেলিয়ান গোটা এলাকাটি থেকে দ্রুত পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হল। এ অভিযানে মোরাপাড়ায় ট্যাঙ্কবাহিনীকে কাজে লাগানো যায় নি। কারণ, ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে দুটি কাদাজলে আটকে পড়েছিল। পরবর্তী রাতে এক আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে মোরাপাড়ার একটা বৃহদংশই কব্জায় আনা সম্ভব হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, পাকিস্তানি বাহিনী ওই গ্রামগুলি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এই যুদ্ধে ভারতের ১৩৯ জন সেনা পুরুষ হতাহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ৮ জন সেনা আধিকারিক এবং ৪ জন জেসিও (জুনিয়র কমিশনড অফিসার)। পাকিস্তানি বাহিনীরও হতাহতের সংখ্যা ছিল সমধিক।

শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা বজায় রেখে, ভারতীয় বাহিনীর ৩৩নং সেনাবাহিনীর প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল রংপুর ও দিনাজপুরে আক্রমণের ধার

অব্যাহত রাখা, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং এদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত সম্পদকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ২২-২৩ নভেম্বর মধ্যরাত্রির অভিযানের পরে হিলি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তাই উত্তরের এই পার্শ্বভাগ ঘুরে এবার অন্যপথে পীরগঞ্জ-গাইবান্ধার শত্রুপক্ষীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে হবে। সেই উদ্দেশে ১৬৫ নং মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আর.এস. পান্নু মহোদয়কে বালুরঘাট ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার দেওয়া হয়েছিল এবং ২০২ নং ব্রিগেডটিকে হিলির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এই সেনাদলকে উত্তর দিকে ফিরে গিয়ে হিলির ১১ কিমি দূরে চরকাই নামক এক সীমান্ত গ্রামে ব্রিগেডিয়ার জি.এস. শর্মার অধীনে ৬৬ নং মাউন্টেন ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার শর্মাও সমজিয়া থেকে ফুলবাড়ি হয়ে চরকাই অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। চরকাই দখল সমাপ্ত হলে ওই সৈন্য ডিভিশনটি পূর্ব দিকে যাত্রা করে শত্রুপক্ষীয় উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী বগুড়া ঘাঁটি বিনষ্ট করতে এগিয়ে গিয়েছিল। ৩৪০ নং মাউন্টেন ব্রিগেডে ছিল ওই ডিভিশনের চতুর্থ ব্রিগেড। সেটির দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার যোগেন্দ্র সিং বক্সী। তাঁকে ওই বাহিনী নিয়ে দিনাজপুরে রিজার্ভ থাকতে বলা হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার জি.এস শর্মা ৪ ডিসেম্বর চরকাইয়ের দখল নিয়েছিলেন। শত্রুপক্ষীয় সেনারা বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, বিল, নালা, জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ওই এলাকাটি, জলাভূমিতে গোলন্দাজি কামান নিয়ে চলাচলের অনুপযোগী ওই স্থানটিতে ভারতীয় সেনারা অভিযান করতে পারবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, ভারতীয় বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে চরকাইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা বিষয়টি ওদের হেডকোয়ার্টারের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের পাঠানো রিপোর্ট বিশ্বাসই করতে পারে নি। কমান্ডারের অধীনস্থ একজন ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, এই জলা ও ঝিলের ভেতর দিয়ে কোনও ট্যাঙ্ক আসতেই পারবে না। হয়তো রিপোর্টার সেনা বিলের মধ্যে কোনও মহিষ বা একাধিক মহিষকে দেখেছে। ক্যাপ্টেন মজা করেই বলেছিলেন, 'তুমি সঠিক জিনিষই দেখেছো ভাই, কিন্তু আমি শপথ নিয়েই বলতে পারি যে, মোষগুলোর পিঠে ১০০ এম.এম. বন্দুক বসানো আছে এবং মোষগুলো একের পর এক আমাদের বাঙ্কার তাক করে এগিয়ে আসছে।'

ইতিমধ্যে কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এফ.পি. ভাট্টি হিলি ও চরকাইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ শত্রুসেনা বেষ্টিত হয়ে কিছুতেই ব্রিগেডিয়ার জি.এস. শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। ওই সময়ে ৫ নং গাড়োয়াল বাহিনী আপ্রাণ লড়াই করে যাচ্ছিলেন। ফলে, ওই যুদ্ধে ৬৫ জন সেনার জীবনহানি ঘটে। ওই নিহত সেনাদের মধ্যে পাঁচজন সেনা অফিসার ও চারজন জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসারও ছিলেন। পাকিস্তানি সীমান্ত সেনাবাহিনীর কমান্ডার মেজর আক্রাম ওই যুদ্ধে নিহত হবার পর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় সাহসিকতার জন্য মরণোত্তর সর্বোচ্চ সম্মান 'নিশান-ই-হায়দার' লাভ করেছিলেন। তবে পাকিস্তানি সেনা কোম্পানির মাত্র চল্লিশজন সেনা ওই

হিলির অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় সেনারা অতি সহজেই বালুরঘাটের ছড়ানো ছিটানো স্ফীত এলাকা দিয়ে হিলিতে প্রবেশ করে পাকিস্তানি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে পারে। পাকিস্তানি বাহিনী মে মাস থেকেই হিলিতে ছিল বেশ সক্রিয়। ১ নভেম্বর ওরা ভারতের ভেতরে বালুরঘাট এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল। এর ফলে জেনারেল অরোরা হিলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য শত্রুপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেঃ জেনারেল থাপা সেভাবে আক্রমণ করার বিরোধিতা করেছিলেন।

যুদ্ধে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন।

রংপুর-বগুড়ার সড়ক পথে পীরগঞ্জ নামক স্থানের অবস্থান। ওই পীরগঞ্জ দখল করার পর পুনরায় ভারতীয় সেনাদের আক্রমণ পাকিস্তানিদের চমকে দিয়েছিল। এ যুদ্ধে জয়ের পর তাদের ধারণা হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। ৫ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার জি.এস. শর্মা নবাবগঞ্জ দখল করার পর পীরগঞ্জ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেছিলেন। কারণ, ওই সময়ে বিভাগীয় কমান্ডার ৩৪০ নং ব্রিগেডকে পীরগঞ্জ দখল করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই ব্রিগেডটি ৭ ডিসেম্বরে সকালের দিকে রওনা দিয়েছিল। ওই বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ২/৫ গোর্খা রাইফেল বাহিনী। বিকেল ৪.৩০ টার সময়ে রাজপথে তাদের থামতে হল। মনে হল, কোনও আক্রমণ ঘটতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনও সেনার দেখা পাওয়া গেল না। রংপুরের দিক থেকে আগত জিপগাড়ির একটা কনভয় লক্ষ্য করে ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছোঁড়া হল। একথা ভারতীয় সেনাদের জানার কথা নয় যে, ওই কনভয়ের একটি জিপের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের ডিভিশনাল কমান্ডার মেজর জেনারেল শাহ্। ওই গাড়িটি ও গাড়িতে থাকা একটা ম্যাপ সংগ্রহ করা গেলেও মেজর জেনারেলকে ধরা যায় নি। তিনি জিপগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে পথের ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পীরগঞ্জ দখল করা পাকিস্তানিদের চমকে দিয়েছিল। কারণ, তারা ভেবেছিলেন যে, এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে ভারতীয় বাহিনীর বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। তাদের এগিয়ে আসতে হলে করতোয়া নদী সেতু অতিক্রম করতে হবে। এমনকি ডিভিশনাল কমান্ডার ও তার লোকজন ঝোপেঝাড়ে আত্মগোপন করলেও, তারা ভেবেছিলেন এটা ছিল হঠাৎ হানা মাত্র। কিন্তু খুব দ্রুত একটা প্রতি আক্রমণে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার সহ বেশ কয়েকজনকে হারিয়ে ফেলেন। মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিংকে বগুড়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ২০২ নং ব্রিগেডকে প্রথমে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের বলা হয়েছিল ওই বাহিনী ঘোড়াঘাট এলাকায় ৬৬নং ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হবে এবং শেষে খেতাল হয়ে বগুড়া যাবে। একই সঙ্গে ৬৬ নং ব্রিগেডটি নবাবগঞ্জের দক্ষিণে ভাদুড়িয়া দখল করে ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জ দখল করে ৩৪০নং ব্রিগেডের সঙ্গে একত্রিত হবে। শেষোক্ত বাহিনীটি পীরগঞ্জ থেকে রওনা দিয়ে গোবিন্দগঞ্জ দখল করে প্রধান সড়কপথে বগুড়া অভিমুখে রওনা দেবে।

অক্টোপাসের মত বহু দাঁড়া বিশিষ্ট এই অভিযান সেনা ডিভিশনের সম্পদের বৈচিত্রকে প্রকাশ করেছিল। ব্রিগেডিয়ার যোগেন্দ্র সিং বক্সী ইত্যবসরে বগুড়ায় হাজির হতে পেরেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার এফ.ফি. ভাট্টি ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে হিলি এলাকা পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছিলেন। তারপর তার ব্রিগেডটি যখন বগুড়ার পথে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছিল, তখন সেতুবিহীন একটি নালা তার যাত্রায় বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু ইতোমধ্যে জানা গিয়েছিল যে, ৩৪০নং ব্রিগেড বগুড়া দখল করে নিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার ভাট্টিকে বিপরীত দিকে উত্তরবঙ্গের রংপুরে মার্চপাস্ট করে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার শর্মাকে ভাদুড়িয়াতে ঘাঁটি গেড়ে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১ ডিসেম্বর ওই গ্রামাঞ্চলে একটা কঠিন যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়েছিল। ওই যুদ্ধে ১৩২ জন সেনা জওয়ান আহত ও নিহত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পাঁচজন সেনা আধিকারিক এবং চারজন জেসিও। করতোয়া নদীর দক্ষিণে গোবিন্দগঞ্জ ৫/১১নং গোর্খাবাহিনী এবং পি.টি.-৭৬ ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিচ্ছিন্ন শাখা দখল করে নিয়েছিল। এ জয়ের জন্য বাহিনীকে একটু ঘুরপথে আক্রমণ করতে হয়েছিল। অবশ্য পাকিস্তানিরা মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রত্যাশা নিয়ে মুখিয়ে ছিল এবং সেজন্যে রাজপথের সেতুটি বিনষ্ট করে দিয়ে নদীর দক্ষিণ তীরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আরও বিস্ময়কর ঘটনা পাকিস্তানিরা ১১ ডিসেম্বর বিকেলবেলা জানতে পেরেছিল যে, তাদের পিছিয়ে যাবার রাস্তাটাও কেটে দেওয়া হয়েছিল। তাই টুকরো টুকরো দলে বিভক্ত হয়ে তারা রাতের সমস্ত ভারি ভারি অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল।

গোবিন্দগঞ্জে ভেঙে দেওয়া সেতুটি পুনরায় নতুন

করে গড়তে অনেকটা সময় লেগেছিল। ইতোমধ্যে ৫/১১ গোর্খা রাইফেল বাহিনী ও ৬৯ নং গোলন্দাজ বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো ইছামতী নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল। ওরা দেখতে পেল যে, নদীর দক্ষিণ তীরে পাকিস্তানি সেনারা চেপে বসেছে। সে যাই হোক, গভীর রাতে ওই ব্যাটেলিয়ান থেকে এক কোম্পানি সেনা কোনওভাবে নদীর দক্ষিণ পাড়ে ঢুকে যেতে পেরেছিল এবং ওই সেতুটির দুই কিমি দূরে রাস্তাটি বন্ধ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। তার পরে পরেই ওই ব্যাটেলিয়ানের বাকি সেনারা বিপক্ষীয় সেনাদের ছোটখাটো বাধা দেবার চেষ্টাগুলো ঝাঁটার মত ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। ১২ ডিসেম্বরের বিকেলবেলায় ওই বাহিনী মহাস্থানে এসে হাজির হয় এবং সন্ধ্যা নাগাদ তারা করতোয়া সেতুটি দখল করে নেয়। একই ভাবে উভয় ব্রিগেডের সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের পূর্বেই রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ঘাগট নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

এখন ৩৪০ নং ব্রিগেডের অবস্থান ও বগুড়ার মধ্যে নদীঘটিত কোনও প্রতিবন্ধকতা আর থাকল না। পাকিস্তানি ডিভিশনাল কমান্ডারের আর বুঝতেও বাকি থাকল না, এবার কোথায় গোলাবর্ষণ ঘটতে পারে। তাই ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে তারা তাদের সৈন্যবাহিনীর হেডকোয়ার্টার সেখান থেকে সরিয়ে নাটোরে নিয়ে গিয়েছিল।

মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিং পরিকল্পনা করেছিলেন যে, দক্ষিণ দিক থেকে বগুড়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। নিজেরা নিজেদের অবস্থানকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মুখোমুখি ওদের আক্রমণ করবেন। যুদ্ধ পরিচালনার প্রাথমিক ওই পরিকল্পনা ১৪ ডিসেম্বরের সকালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল। ৬ নং গার্ড বাহিনী এবং ৬৯ নং গোলন্দাজ বাহিনীর একটি রেজিমেন্ট (এক স্কোয়াড্রনের কম সৈন্য) বগুড়ার পেছন দিকের রাস্তাটি বন্ধ করে প্রস্তুতি নিয়েছিল। তারপর ৬৩ নং অশ্বারোহী বাহিনী এবং ২/৫ নং গোর্খা রাইফেল বাহিনী ওদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই শুরু করে দিয়েছিল। ওই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য ওই বাহিনীর অধীনে ৩৪০ নং ব্রিগেড ও ৪ নং মাদ্রাজ বাহিনীকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

বগুড়ার লড়াইটা ছিল বেশ শক্ত। বিশেষত ঘুরপথে ট্যাঙ্কবাহিনীর পক্ষে শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোটা ছিল কষ্টকর। ওই মুহূর্তে ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনী সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। ১৪ ডিসেম্বর দুপুরবেলায় রেল লাইনের উত্তরাঞ্চল এবং শত্রুপক্ষের ক্যান্টমেন্ট দখলে এসেছিল। তবুও ২০৫ নং শত্রুপক্ষীয় ব্রিগেড তখনও সেখানে ছিল বলে ওরা দক্ষিণ দিক থেকে প্রতিরোধ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। পরদিনও ওই সীমাবদ্ধ এলাকায় পাকিস্তানি আক্রমণ চলতেই থাকে। ১৬ ডিসেম্বরে দুপুরের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর ছোট ছোট সেনাদল আত্মসমর্পণ শুরু করে দিয়েছিল এবং দিন শেষে যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিকেল ৪.৩০ টার সময়ে রাজপথে তাদের থামতে হল। মনে হল, কোনও আক্রমণ ঘটতে পারে। রংপুরের দিক থেকে আগত জিপগাড়ির একটা কনভয় লক্ষ্য করে ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছোঁড়া হল। একথা ভারতীয় সেনাদের জানার কথা নয় যে, ওই কনভয়ের একটি জিপের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের ডিভিশনাল কমান্ডার মেজর জেনারেল শাহ্। ওই গাড়িটি ও গাড়িতে থাকা একটা ম্যাপ সংগ্রহ করা গেলেও মেজর জেনারেলকে ধরা যায় নি। তিনি জিপগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে পথের ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর জেনারেল লক্ষ্মণ সিংকে কালবিলম্ব না করে রংপুর দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই আদেশের অর্থ হল ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে সেনাদলকে আন্তর্জাতিক সড়ক পথে এগোতে হবে। ২০২নং

ব্রিগেডকে যে এর আগেই ওই কাজ করতে বলা হয়েছিল, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম। ওই বাহিনীর সঙ্গে ৬৬নং ব্রিগেডটিকে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। ওই দুই বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ১৫ ডিসেম্বরে যখন ২০২ ইং ব্রিগেডটি রংপুরের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল, তখনই জেনারেল লক্ষ্মণ সিংকে এক স্কোয়াড্রন গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অথচ তাঁর ওই বাহিনীই রংপুর আক্রমণে সহযোগিতার কথা ছিল।

জানা গিয়েছিল যে, রংপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ট্যাঙ্ক বাহিনীও ছিল। ফলে, ট্যাঙ্ক বাহিনী ছাড়া রংপুর অভিযান, ওই প্রেরিত নির্দেশে, এগিয়ে চলা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এক চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তবুও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগের মুহূর্তে ভারতীয় ওই দুই ব্রিগেড সেনা রংপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে ঘাগট নদীর তীরে হাজির হয়েছিল।

সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে থাকা পাকিস্তানি সেনারা ভারতের সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করেছিল। ওরা ভারতের অভ্যন্তরে বোমাবাজি করে, অন্তর্ঘাত করে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। পাকিস্তানি সেনাদের এরূপ কার্যকলাপের প্রতিরোধের কথা ভারতীয় সেনাদেরও ভাবনায় আসে।

৬ নং মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনে থাকা দুটি ব্রিগেডের মধ্যে ৯ নং বাহিনীকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে লালমণিরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই বাহিনী তিস্তা নদীর উত্তরাঞ্চলকে দখল করে রেখেছিল। এড হক এক স্কোয়াড্রন কামানবাহিনী ও ৩৩ নং পদাতিক বাহিনীকে ৭১ নং ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরগাঁও থেকে ওই সংযুক্ত বাহিনী এগিয়ে আসার পথে ৫ ডিসেম্বরে বীরগঞ্জ দখল করে নিয়েছিল কিন্তু তারপরে আর এগোতে পারে নি।

জানা গিয়েছিল যে, দিনাজপুর শহর থেকে পাকিস্তানিরা সরে গিয়েছে। ওই কথা জানতে পেরে ব্রিগেডিয়ার কাথপালিয়া দু'কোম্পানি হানাদার বাহিনীকে ওই শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুর শহরে তখনও বেশকিছু বিপক্ষীয় সেনা ছিলই, ছিল কামানও। ফলে ভারতীয় হানাদার বাহিনী সঙ্গে কামান না নিয়ে যাওয়ায়, ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

এরপর ব্রিগেডিয়ার কাথপালিয়াকে সৈয়দপুর অভিযান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানিরা তাঁর গতিরোধ করার জন্য মোটর গাড়িতে কিছু সেনা পাঠিয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট ওই বাহিনীকে চিহ্নিত করে গোলন্দাজ বাহিনী ও বায়ুসেনা বাহিনীর সাহায্যে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ১৫ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় ৭১ নং ব্রিগেড বাহিনী সৈয়দপুরে কয়েক কিমি দূরে পৌঁছে গিয়েছিল। পরদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরে দিনাজপুরের শহর রক্ষায় নিযুক্ত পাকিস্তানি সেনারা ব্রিগেডিয়ার কাথপালিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানের ৫৭ নং ব্রিগেডের দুটি সেনাদল হার্ডিঞ্জ সেতু অতিক্রম করতে সমর্থ হলেও ওই সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। ফলে ওই সেনারা আত্মসমর্পণকারী ৩৩টি সেনাদলের সৈন্যসংখ্যাকে স্ফীত করেছিল মাত্র। মোট আত্মসমর্পণকারী সেনাদের মধ্যে ৩৪৫ জন আধিকারিক, ৫৯৭ জন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার, ১৫,৪৪৩ জন অন্যান্য পদাধিকারী। এছাড়াও ৬,০০০ জন আধাসামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানবাহিনীর মোট সেনা সংখ্যা এক্ষেত্রে ২২,৩৮৫ জন।

রাজশাহী জেলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নবাবগঞ্জ দখলে ১২ ডিসেম্বরে ওই সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল অসমান্য। আসলে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সব সেক্টরেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা একটা পৃথক ইতিহাস।

(তথ্য সর্বস্ব নথিটির সাবলিল ভাবানুবাদ করতে না পারার ব্যর্থতায় দুঃখিত। অনুবাদক— উমেশ শর্মা)

কৃতজ্ঞতা ও তথ্যসূত্র:

(১) Veelay's history book, Chapt-6.

(২) Major K. C. Praval, Indian Army After Independence.

(৩) মহঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার

এপারের চোখে মুজিব

নিখিলেশ রায়চৌধুরী

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের কিছু আবছা স্মৃতি রয়েছে। তখন টালিগঞ্জের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে ভাড়া থাকতাম। রেডিও-র 'সংবাদ পরিক্রমা'য় শুনতাম ভারতের সেনাবাহিনীর বিজয়ের খবর। আর শুনতাম 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। বাইরে মাইকে তখন বাজত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মা গো ভাবনা কেন', আর 'ও আমার দেশের মাটি'।

মুজিব

বাবা আনতেন 'কিশোর ভারতী' আর 'শুকতারা'। তাতেও থাকত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কমিকস। 'শুকতারা'র একটা গল্পের কথা এখনও মনে পড়ে। খানসেনা মানে পাক সেনারা আসছে শুনে গভীর রাতে গাঁয়ের সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। কোলের শিশুকে নিয়ে মা-ও অন্ধকারে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল। একটা ঝোপের আড়ালে বসে দেখল, ছায়ার মত খানসেনারা ঘরে ঢুকছে। হাতে তাদের বেয়নেট লাগানো রাইফেল। একটা চাপা কান্নার আওয়াজ যেন। বেরিয়ে এসে তারা ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিল। মা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করল। অনেক দূর আসার পর খেয়াল হল, কোলে চেপে ধরে যাকে এনেছে সে কাঁদছে না। তার এখন দুধ খাওয়ার সময়। তখন কাঁথা সরিয়ে মা দেখল, সে খোকার একটা পাশবালিশ তুলে এনেছে।

পরবর্তী কালে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের সেই ছবি বার বার উদ্বেলিত করেছে। ভারতের সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি-র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা-র হাতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত রিস্ট ওয়াচ। বাবার হাতেও তখন ও রকমই একটা রিস্ট ওয়াচ। কম দামী, তবে স্টিলের ব্যান্ড। বোধ হয়, এইচএমটি-র।

স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় প্রফেসর তরুণ সান্যালের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অগিলভি হস্টেলে স্যারের আশ্রয়ে ওপার বাংলার একাধিক বুদ্ধিজীবী থাকতেন। কবি সামসুর রাহমান সহ অনেকে। খানসেনার থাবা থেকে তাঁরা কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

ভারতের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকেছিল কর্ণফুলি নদী ধরে। অসম থেকে। পাক সেনারা পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত বরাবর পাহারায় ছিল। তারা ভাবতেও পারেনি 'ম্যাকবেথে'র ভবিষ্যদ্বাণীর মত ভারতের সেনাবাহিনী উপর থেকে জলপ্রপাতের মত নেমে আসবে। ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ'র বাহিনী। গোর্খা রেজিমেন্টের আদরের ডাক 'সাম বাহাদুর'। ইস্টার্ন ফ্রন্টেই লড়তে লড়তে জীবন দিয়েছিলেন ল্যান্স নায়েক অ্যালবার্ট এক্কা। মরণোত্তর পরমবীর।

বড়িশা হাইস্কুলে পড়ার সময় এয়ারফোর্স এনসিসি করতাম। সেই সময় ভারতের বিমান বাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল ইদ্রিশ হাসান লতিফ। ১৯৮০ সালে ব্যারাকপুর এয়ারবেসের ক্যাম্পে দেখেছিলাম

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের তথ্যচিত্র। হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন-কে ধমকাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের কাগজে স্বাক্ষর করছে পাক সেনাপতি নিয়াজি।

ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের সেনাবাহিনী না-থাকলে কোনওদিনই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতে পারত না। মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সফল করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা, ব্রিটেন সহ একাধিক ধনী দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু সেইসব পশ্চিমা দেশের নেতৃবর্গ তখন পাকিস্তানের আয়ুব খান-ইয়াহিয়া খানদের সমর্থন করছে। তারা ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মাও সে-তুংয়ের লাল চীনও তখন পুরোদমে পাকিস্তানকে সহায়তা দিচ্ছে। আমেরিকার প্রশাসনের সঙ্গে মাও সে-তুংয়ের বেজিংয়ের সম্পর্ক তখন গাঁটছড়ায় বাঁধা। সেই সংকটের মুহূর্তে বন্ধু হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিল মস্কো এবং তাদের স্যাটেলাইট দেশগুলির সামরিক জোট ওয়ারশ প্যাক্ট।

পূর্ব পাকিস্তানের এয়ারফিল্ডগুলোয় পাক সেনাবাহিনীর আমেরিকান যুদ্ধবিমান যাতে আর ওঠানামা করতে না-পারে, তার জন্য ভারতের বিমান বাহিনী সেগুলো বোমা মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। পলক ফেলার আগেই ভারতের 'জওয়ান'রা ঘাড়ে এসে পড়েছে শুনে পালানোর সময় পাক সেনারা পদ্মার উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ভেঙে দিল। রাশিয়ান অ্যামফিবিয়ান ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারতের সেনাবাহিনী নদী পেরিয়ে যথারীতি তাদের ধরে ফেলল।

ইন্দিরা গান্ধীকে ভয় দেখানোর জন্য আমেরিকান নেভি বঙ্গোপসাগরে ভারতের জলসীমায় তাদের পরমাণু শক্তিধর সপ্তম নৌবহর পাঠাল। খবর পেয়ে ক্রেমলিন রাশিয়ান নৌবাহিনীর টোয়েন্টিয়েথ ফ্লিটকে ধাওয়া করতে বলল। দুই নৌবহরের দুই সেনাপতি দূরবীণ চোখে লাগিয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। রাশিয়ান নৌবহরের সেনাপতি মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সেনাপতিকে তারবার্তায় হুঁশিয়ারি পাঠালেন। সপ্তম নৌবহর ফিরে গেল। বাংলাদেশ জন্ম নিল।

ভারতের সেনাপতি ঢাকায় ঢুকলেন। সঙ্গে কনভয়। মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। অবিশ্রান্ত রক্তপাতের পর অবশেষে বাংলাদেশে নতুন সকাল। কিন্তু, মুজিবুরের কোনও খবর নেই। তিনি তখনও রাওয়ালপিন্ডির জেলে। তাঁকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে কি না, তাও জানা যাচ্ছে না। তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল। নিক্সন প্রশাসন বুঝতে পারল, ভারতীয় উপমহাদেশে চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ষড়যন্ত্র কষতে গিয়ে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে হেরে গিয়েছে। নিক্সন প্রশাসনের নির্দেশে 'বঙ্গবন্ধু'-কে রাওয়ালপিন্ডি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

পরে, কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 'বঙ্গবন্ধু'-কে নিয়ে মিটিং করেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ঢল। সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'এপারের চোখে মুজিব (১৯২০-২০২০)' বইতে সেই মিটিংয়ের কথা লিখেছেন দেবপ্রসাদ রায়। তাঁর লেখার শিরোনাম 'মুজিববর্ষে শেখ মুজিব'।

মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী অনেকেরই চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তখনকার মত হেরে গিয়েছিল প্রতিক্রিয়ার শক্তি। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু তাদের রাগও যায় নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে তারা কামড় বসাল। ঢাকার ধানমণ্ডির বাড়িতে রক্তবন্যা বইল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে কার্যত ইন্দিরা গান্ধীকেই সতর্ক করা হল।

সেদিন বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তাদের কেউ কেউ পালিয়ে মাও সে-তুংয়ের লাল চীনে আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন, মেজর ডালিম।

ওই দিনটার কথা কিছুটা মনে আছে। তখন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বাসা ছেড়ে আমরা বছরখানেক বেহালায় ওল্ড ডগ রেস কোর্সের সরকারি আবাসনে এসেছি। বাবা সকালে উঠে স্নান সেরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বোধহয় ডাকতে এসেছিল। ভিতরের ঘরে একটা ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার

ছিল। তাতে শহিদ ভগৎ সিংয়ের ছবি ছিল। আর বোধহয় মহাত্মা গান্ধী-নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি। কিংবা, ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে শুকদেব আর রাজগুরুর ছবি। ক্যালেন্ডারে ভগৎ সিংয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। পড়ার কথা ভুলে যেতাম। পড়া ভুলে গিয়ে মায়ের কাছে মার খেতাম।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাবা কেবল ঘরে ঢুকে মাকে বলেছিলেন, মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে। মা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি হাঁ করে একবার মা-কে দেখছি, আর একবার ক্যালেন্ডারে ভগৎ সিং-কে। শহিদের মানে তত দিনে জেনে গিয়েছি।

অনেক বছর পরে বাবার কাছে সেদিনের ঘটনার কথা শুনেছিলাম। বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। পরবর্তী কালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত তাঁর প্রিয় এবং বিশ্বস্ত ক্যাডার দেশপ্রেমিক সঙ্কর্ষণ রায়চৌধুরীকে নিয়ে সেদিন ভূপেশ গুপ্তর কাছে গিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সদস্য, ইংরেজি 'মেনস্ট্রিম' পত্রিকার সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তীর মত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যসভার এমপি ভূপেশ গুপ্ত-ও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয় বন্ধুদের একজন। অকৃতদার ভূপেশ গুপ্ত কলকাতায় এলে রানিকুঠি কিংবা নাকতলায় ভাইয়ের বাড়িতে উঠতেন। ভূপেশ গুপ্ত সেদিন কলকাতায় ছিলেন।

ভূপেশ গুপ্ত-র কাছে যাওয়ার সময় গাড়িতে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বাবাকে বলেছিলেন, মুজিবুর রহমান অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের খেসারত দিয়েছেন। 'র'-এর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে খবর পৌঁছেছিল, মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। যে কোনও দিন তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। এয়ারফোর্সের দু'জন কমিশনড অফিসার 'বঙ্গবন্ধু'-কে ভারতে আনতে গোপনে বিমান নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন। মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, আমারে মারবে কেডা? ঘাতকেরা টের পেয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার ওই দুই অসমসাহসি অফিসার আর দেশে ফিরতে পারেন নি।

ভূপেশ গুপ্ত-র কাছে পৌঁছে দেখেন, তিনি একটা ছেঁড়া হাফ-হাতা গেঞ্জি আর ততোধিক ছেঁড়া লুঙ্গি পরে 'স্টেটসম্যান' পড়ছেন। ভূপেশ গুপ্ত একটা কানে খাটো ছিলেন। তায় আপনভোলা। কিন্তু যেমন সৎ, তেমনই ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে সেরা কূটনীতিকদের একজন। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত গিয়ে প্রথমেই তাঁর পরিধেয়র দশা দেখে বকাবকি করলেন। তার পর দুঃসংবাদটা দিলেন। বললেন, তোমাকে এখনই দিল্লি যেতে হবে। বাংলাদেশে ক্যু হয়ে গিয়েছে।

শুধু সপরিবারে 'বঙ্গবন্ধু' নয়, তাজউদ্দিন সহ মুজিবুরের গোটা ক্যাবিনেটকেই পাকিস্তানপন্থী ঘাতকেরা হত্যা করে। 'বঙ্গবন্ধু'র মৃত্যুর পর বাংলাদেশের কবিরা একটা কবিতার বই বের করেছিলেন। চটি বই। ইস্তাহারের মত। নাম 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়'। তাতে কিছু অসাধারণ কবিতা ছিল। শোক ছিল, সেইসঙ্গে ছিল ঘাতক বাহিনীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা।

যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম, সেই স্বপ্ন সম্ভব করার সুযোগ মুজিবুর রহমান পান নি। ঢাকায় যেদিন ভারতের সেনাবাহিনী ঢুকেছিল, সেই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। সুখরঞ্জনদাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় সুখরঞ্জনদা ভারতের সেনাবাহিনীর কনভয়ে চেপে খুলনা থেকে ঢাকায় পৌঁছেছিলেন। সুখরঞ্জনদা তখন 'যুগান্তর'-এ। সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র কাছেই শুনেছিলাম, ভারতের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ না-করে বসিরহাট থেকে সীমান্ত পেরিয়ে দুই তরুণ সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার আর খানসেনাদের নারকীয় অত্যাচার কভার করতে গিয়েছিলেন। ভারতের সাংবাদিক টের পেয়ে রাজাকার আর খানসেনারা তাঁদের হত্যা করে।

ঢাকায় পৌঁছে সুখরঞ্জনদা সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন, ভারতের সেনাবাহিনীর দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র আর সামরিক উর্দি পরে একপাল লোক ভারতের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করছে! বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে দু ঘণ্টাও হয় নি। ভারতের আর্মির বিরুদ্ধে কুৎসিত গাল পাড়তে পাড়তে বলছে, 'এরা এখনও যায় না ক্যান?' এমন 'কৃতজ্ঞ' লোকজন তখনই বাংলাদেশের নতুন রাজধানীতে ছিল। কয়েক

বছরের মধ্যে সপরিবারে মুজিবুর নিহত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর তাঁর মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি কাদের 'টাইগার' সিদ্দিকি কলকাতায় এসে আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি হোটেলে বাস করতেন। 'র'-ই তাঁকে নিরাপত্তা দিত। একাত্তরের যুদ্ধের সময় পার্ক সার্কাসে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনে যৌথভাবে হানা দিয়ে ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এবং 'র' পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুপ্তচরদের নামের তালিকা বের করে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর হয়ে সেই অভিযানে অংশ নেন সমর বসু। পরে তিনি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত-র সঙ্গে মিলে 'বর্তমান' সংবাদপত্র বের করেছিলেন। 'অভিজ্ঞতার আলোয় হমলোগ' নামে নিবন্ধ লিখতেন।

পার্ক সার্কাসে পাকিস্তানি ডেপুটি হাই-কমিশনে মেলা গুপ্তচরদের তালিকায় অন্যান্য নামের সঙ্গে ছিল সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের নাম। ভারত-বিরোধী প্রচার চালানোর জন্য এক পাক মেজরের কাছ থেকে তাঁর নামে পয়সা আসত। একইভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়েই বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি ধরা পড়ে যান। তিনিও পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। ধরা পড়ার পর বাকি জীবনটা তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কাটিয়েছিলেন।

একাত্তরের যুদ্ধের সময় পার্ক সার্কাসের পাক ডেপুটি হাই-কমিশনে যত প্রমাণ মিলেছিল সব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এই ধরনের 'মগ্ন মৈনাক'-দের সম্পর্কে তেমন কিছু হাইলি-কনফিডেন্সিয়াল ফাইল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত-ও দেখেছিলেন। 'বর্তমান'-এর এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টে থাকতে (২০০৩-২০১৪) বরুণদা-র কাছে শুনেছিলাম, তেমন কিছু হাইলি-কনফিডেন্সিয়াল ফাইল দেখে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত অফিসারদের বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি এ সব ঢুকিয়ে রাখুন! না হলে ভারতবাসীর অনেক স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীনও ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সাধারণ প্লেনে যাতায়াত করতেন। দেহরক্ষী নিতেন না। একবার দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরার সময় প্লেনে বরুণদা-র সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত-র দেখা হয়েছিল। দেহরক্ষী না-দেখে বরুণদা জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত জবাব দেন, কে আমাকে মারবে?

'বঙ্গবন্ধু' মুজিবুর রহমানের ঘাতকেরা সবাই এখনও ধরা পড়ে নি। মুজিবুর রহমানের শতবর্ষেও একাধিক ঘাতক বাংলাদেশ সরকারের নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে। তাদের কোনও দিনই বাংলাদেশ সরকার ফেরাতে পারবে না। শতবর্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের পুজো এমন অনেকেই করছে, এক দিন যারা ধানমণ্ডিতে রক্তস্রোত বওয়ায় খুশি হয়েছিল।

শতবর্ষে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রণাম জানিয়ে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য 'এপারের চোখে মুজিব (১৯২০-২০২০)' শিরোনামে যে বইটি সম্পাদনা করেছেন তাতে নানা ভাবে চীনের প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতকে ঘিরে ফেলার জন্য চীন বাংলাদেশেও ঘাঁটি গাড়ার নিরলস চেষ্টা করছে। যে চীন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের ঘোর বিরোধী ছিল। আমেরিকান প্রশাসনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পাকিস্তান আর্মির জয় চেয়েছিল।

আগেই লিখেছি, মুজিবুর রহমানের অন্যতম ঘাতক মেজর ডালিম চীনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' মাও সে-তুং তার নিজের দেশেই সাত কোটির বেশি মানুষ মেরেছিল। হিটলার, স্ট্যালিনের রেকর্ড ব্রেক করে দিয়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধের সময় সেই মাও সে-তুংয়ের চ্যালারা ভারতের মাটিতে বসে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হোক তারা চায় নি।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও চীনের 'পঞ্চম বাহিনী' কাজ করছে। তারা চায়, নেপাল যেমন মাওবাদীদের খপ্পরে গিয়েছে, শ্রীলঙ্কা আর মালদ্বীপ যেমন চীনের থাবায় ঢুকেছে, মায়ানমারের আর্মি যেমন চীনের হাতের পুতুল, ঠিক তেমন ভাবেই বাংলাদেশও চীনের গ্রাসে যাক। চীনা অ্যাপ এই 'পঞ্চম বাহিনী'-কে সাহায্য করছে। চীন যাতে ভারতকে ঘিরে ফেলে, এই 'পঞ্চম বাহিনী' সেটাই চায়।

চীনের সঙ্গে আমেরিকার ঝামেলা মূলত

বহুজাতিক ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে। আজ-বাদে-কাল ট্যারিফ সংক্রান্ত সমস্যা মিটে গেলে আমে-দুধে মিশে যাবে। কিন্তু চীনের ভারত ঘিরে ফেলার চক্রান্তে কখনই ভাটা পড়বে না। সীমান্ত নিয়ে ঝামেলাও কখনও মিটবে না। 'পঞ্চম বাহিনী' ভারতে বসে চীনকেই ইন্ধন জোগাবে।

'এপারের চোখে মুজিব (১৯২০-২০২০)' বইটিতে বাংলাদেশের জন্মের পিছনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ' তথা ভারতের সেনাবাহিনীর অবদান নিয়ে বিশেষ একটি লেখা থাকলে ভাল হত। কয়েক বছর ধরেই প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশে শেখ মুজিবুরের শতবর্ষ এবং বাংলাদেশের ৫০ বছরের কথা মাথায় রেখে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চা হচ্ছে বলে শুনেছি।

কিন্তু ভারতের সেনাবাহিনী না-থাকলে সেই 'মুক্তিযুদ্ধ' কোনও দিনই সফলতার মুখ দেখত না। শুনতে খারাপ লাগলেও, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভিয়েতনামের গেরিলা বাহিনী ছিল না। আমেরিকার সেনাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গেরিলাদের পাশে উত্তর ভিয়েতনাম ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিম দিয়ে তৈরি করেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর নন-কমিশনড অফিসাররা, পিআই (ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর) স্টাফ-রা।

সে এক ভয়াবহ খাটুনি! লুঙ্গি-পরা 'মুক্তি'-দের ড্রিলের লাইনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে লেফট রাইট করানো। কাঠের বন্দুক হাতে দিয়ে রাইফেল ধরাতে শেখানো। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এভাবেই রাতারাতি শেখ মুজিবুরের মুক্তিফৌজ গড়েছিলেন ভারতের সেনাবাহিনীর পিআই স্টাফরা। তাঁদের অবদানের কথা কোথাও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল না।

সুমন ভট্টাচার্যের সম্পাদিত বইটি শুরু হয়েছে বিখ্যাত সাংবাদিক, পরবর্তী কালের রাজনীতিক এম জে আকবরের একটি ইংরেজি লেখা দিয়ে। তিনি ছাড়া লিখেছেন সোমেন সেনগুপ্ত, কেশব মুখোপাধ্যায়, সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ রায়, জয়ন্ত ঘোষাল, গৌতম রায়, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সাইফুল হক, সুমিত সেনগুপ্ত, আনিস আহমেদ, অনিকেত মহাপাত্র, মইনুল হাসান, কৌশিক কর্মকার, নচিকেতা চক্রবর্তী মানে গায়ক নচিকেতা, কামরুল আহসান খান, পার্থ প্রতিম মজুমদার, তৌহীদ রেজা নূর, গৌতম ভট্টাচার্য, সৌমেন নাগ, নন্দিনী ভট্টাচার্য পান্ডা, মঞ্জীরা সাহা, মোহাম্মদ সাদউদ্দিন, সৌমিত্র মিত্র, রুমনা সরকার, বীথি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ তানভীর নাসরীন, রূপক সাহা, দীপঙ্কর গুহ, ব্রাত্য বসু, অনিরুদ্ধ ধর, রাজেশ দাস, দেবযানী আইচ, অভিজিৎ ঘোষাল, তুহিন শুভ্র মন্ডল, অরবিন্দ সামন্ত, সুভোব্রত সরকার, প্রভাত ভট্টাচার্য্য, অনুপ পল্ল্যে, তাপস কুমার চক্রবর্তী এবং সৌগত বসু।

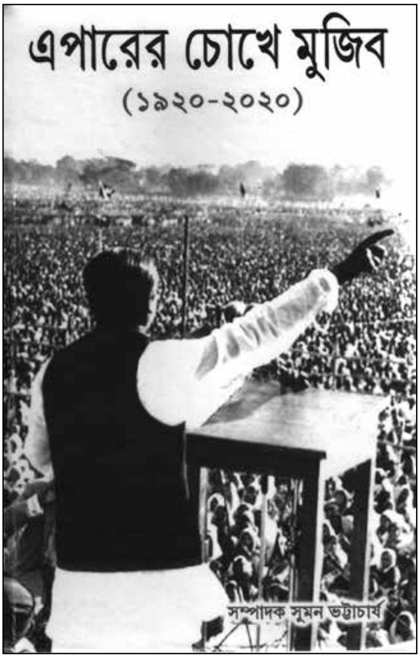

এপারের চোখে মুজিব (১৯২০-২০২০)।। সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য।। প্রকাশক বইওয়ালা প্রকাশন, কলকাতা ৭০০ ০৫০ ও সময় প্রকাশন, ঢাকা ১১০০, বাংলাদেশ।। প্রচ্ছদ কৌশিক মিত্র।। মূল্য ৫০০ টাকা।

বইটি অনলাইনে অর্ডার করে দিতে পারেন। হোয়াটস্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮। বই আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

করোনা উত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটছে

এশিয়ার নেতৃত্বে উঠে আসবার চ্যালেঞ্জ ভারতের

সুমন ভট্টাচার্য

ডোনাল্ড ট্রাম্প হেরে গেছেন, ইতালির প্রধানমন্ত্রী গিউসেপ্পে কন্তেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে, নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দায়িত্ব নিয়েই প্রথম টেলিফোন আলাপচরিতায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যা যা বলেছেন তা ওয়াশিংটন এবং মস্কোর মধ্যে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হওয়ার ইঙ্গিত। আর এশিয়ায় চিন এবং ভারতের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের যে দড়ি টানাটানি চলছে, তাতে 'ভ্যাকসিন কূটনীতি'র দৌলতে আপাতত নয়াদিল্লি কয়েক কদম এগিয়ে।

এটা যদি আপাতত বিশ্ব রাজনীতির 'স্পিড হেডলাইন' হয়, তাহলে ২০২১-এ রাজনীতি কোনদিকে হাঁটবে?

রাজনীতির একজন ছাত্র হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তা অনেকটাই নির্ভর করবে কমলা হ্যারিস, আমেরিকার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট, যিনি শুধু তাঁর গায়ের রঙ নয়, তাঁর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চর্চার কেন্দ্রে, তিনিই নির্ধারণ করবেন। কমলা হ্যারিস যাঁর ডেপুটি, সেই জো বাইডেন ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে যতটা অকেজো বা একদেশদর্শিতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সেই পথে হাঁটবেন না। পুতিনের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপে এটা স্পষ্ট, মস্কো যদি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মত করে ব্যবহার করতে চান, তাহলে বাইডেনের মার্কিন প্রশাসন 'নির্বাক শ্রোতা' হিসাবে বসে থাকবে না। সেটা ইউক্রেনের মত আমেরিকার 'বন্ধু' দেশের ক্ষেত্রেই হোক বা খাস রাশিয়ায় সরকার বিরোধী নেতা বলে পরিচিত নাভালনির সঙ্গে ক্রেমলিন কী রকম ব্যবহার করছে, তা নিয়েই হোক।

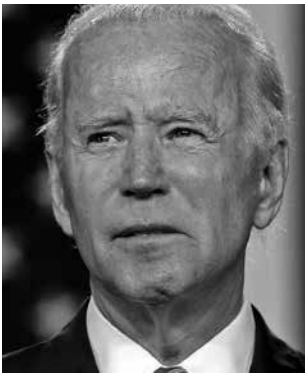

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কি গেম চেঞ্জার?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল 'আমেরিকা ফার্স্ট'। সেই কারণেই তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার সময় সহযোগী শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে সিরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, 'আইএস' এর বিরুদ্ধে লড়াই অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল, আফগানিস্থানের থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং তালিবানদের থেকে সমঝোতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্প অস্বাভাবিক দ্রুততা দেখিয়েছিলেন। বারাক ওবামার করে যাওয়া ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাঙেনেই নি, নভেম্বরে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরেও তিনি এমন সব কাজ করেছেন যা ওয়াশিংটন এবং তেহেরানের মধ্যে তিক্ততা আরও বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হয়। যেমন ইসরাইলের গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ'-এর মাধ্যমে ইরানের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করা বা ক্রমাগত তেহেরানের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বক্তব্য দিয়ে যাওয়া। ট্রাম্প পরবর্তী জমানায় জো বাইডেন শুধু রাশিয়া নয়, ইরান বা পশ্চিম এশিয়ার অন্য দেশগুলির সঙ্গেও

আমেরিকার কূটনীতির বদল ঘটাবেন, এমনটাই অনুমান করে নেওয়া যায়। তার কারণ, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় যেমন বাইডেনের উপর বারাক ওবামার 'দীর্ঘ ছায়া' ছিল, তেমনই নতুন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজেদের যে টিম তৈরি করেছেন, তাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করা অনেকে রয়েছেন।

জো বাইডেনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ দেখে কেন রাজনীতির ছাত্র হিসাবে আমি কমলা হ্যারিসকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি? সেটা কি এই কারণে যে তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে এই মুহূর্তে হয়ত দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি? নাকি মার্কিন ইতিহাসে তিনিই প্রথম 'কালার্ড উইমেন', যিনি এই শিখরে পৌঁছেছেন? আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে এই সবকিছুই তো আছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গত তিন মাসে, অর্থাৎ নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে আমেরিকায় হয়ে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ। অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির যে তান্ডব মার্কিন মুলুক দেখেছে, যেভাবে ট্রাম্পভক্তরা খাস ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল হিলে হামলা চালিয়েছে, তাতে আমেরিকার রাজনীতিও এক নতুন মোড় নিয়েছে। বাইডেন এবং হ্যারিস নিজের দেশে অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির যে নৈরাজ্য' দেখে নিয়েছেন, তাতে বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশও অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের নিয়ে সতর্ক থাকবেন। বিশেষ করে কমলা হ্যারিস, যাঁর ধমনীতে একই সঙ্গে ভারতীয় মা এবং জামাইকান পিতার রক্ত বইছে, তিনি অনেক বেশি সতর্ক এবং সংবেদনশীল হবেন। মার্কিনী বিশ্লেষকরা মনে করছেন নারী স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুর অধিকার যেহেতু হ্যারিসের চর্চার এবং রাজনীতির বিষয়, তিনি মার্কিন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়কে সর্বদা অগ্রাধিকার দেবেন।

যেহেতু জো বাইডেন ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত 'নিশচুপ' থাকার পক্ষপাতী নন, এবং প্রথম ফোনে পুতিনকে এই 'সক্রিয়'তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাই এটা সহজেই অনুমেয় আমেরিকা কোন পথে হাঁটবে। বিখ্যাৎ বৃটিশ পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' থেকে শুরু করে ইউরোপের অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যে আবার তার 'স্বকীয় ঔজ্বল্যে' ফিরে আসবে, তাতে কমলা হ্যারিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। হ্যারিসের বক্তব্য অগ্রাধিকার পেলে, আমাদের স্মরণে রাখতে হবে তিনি সেনেটর থাকার সময় কোন কোন বিষয়গুলি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। হ্যারিস যেমন নয়াদিল্লিকে দুশ্চিন্তায় রেখে কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন, তেমনই ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে সৌদি যুবরাজকে বা ইসরাইলের নেতা নিয়াহুকে খোলা ছুট দিয়েছিলেন, কমলা তার সমালোচনায় সরব ছিলেন। আমি ওইজন্যই শুরুতে বলেছিলাম, কমলা হ্যারিসের রাজনৈতিক যাত্রাপথকে দেখলে এবং বিশ্লেষণ করলে আন্দাজ করে নেওয়া কঠিন নয়, যে কোনও ধরনের 'স্বৈরতন্ত্র' 'মৌলবাদ' এবং অতি দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে তিনি হাঁটবেন। এবং তিনি যে প্রশাসনের নেতৃত্ব দেবেন, তার অভিমুখও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী হবে।

করোনা পরবর্তী পৃথিবীর রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই আমেরিকার কথা এই কারণে আলোচনা করতে হচ্ছে না যে ওয়াশিংটন এখনও বিশ্ব রাজনীতির প্রধান ভরকেন্দ্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত তিরিশ বছর ধরে সেটা 'ধ্রুব সত্য'। অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে চিনের দ্রুত উত্থান এবং বেইজিংয়ের 'নয়া আধিপত্যবাদ' সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট শাসিত এই দেশ এখনও কোনভাবেই মননে, দর্শনে এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প গত চার বছরে আমেরিকার বিড়ম্বনা এবং অস্বস্তি যতই বাড়িয়ে থাকুন, এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই 'লিডার অব দ্যা ফ্রি ওয়ার্ল্ড'। ক্যালিফোর্নিয়া প্রবাসী নাসার সঙ্গে যুক্ত বাঙালি অধ্যাপক ছন্দক বসু কিছুদিন আগে একটি আলোচনায় যেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'চিনের আরও ৫০ বছর লাগবে হাভার্ড, ইয়েল বা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মত জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষকেন্দ্র গড়তে'।

কমিউনিষ্ট শাসিত চিন হয়ত গত ২০ বছরে অনেক এগিয়েছে, সস্তা শ্রমিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক

শাসনের জন্য ‘বিশ্বের কারখানা’য় পরিণত হয়েছে এবং গোটা বিশ্বে নিজের আধিপত্যকে ছড়াতে চেয়েছে, কিন্তু করোনা আবার দেখিয়ে দিল বেইজিংকে আসলে কী চোখে গোটা বিশ্ব দেখে। ২০২০তে যদি ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি জার্মানির সব প্রধান সংবাদপত্রে বেইজিংকে দুষে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় চিনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভও আমরা দেখেছি। তার মানে হচ্ছে পরিকাঠামো খাতে ঋণ বা সস্তায় পণ্য সরবরাহ করে চিন যে সকলের মন জয় করে নেবে বলে ভেবেছিল, তা আদতে হয় নি। ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশেই সন্দেহ করছিল করোনার ভাইরাসের প্রথম আবির্ভাব থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সময় বেইজিং আসলে তথ্য গোপন করছিল। একের পর এক মার্কিন সংবাদপত্র মোটামুটি দিনক্ষণের হিসাব করে দেখিয়েছে করোনার ভাইরাস ছড়ানো নিয়ে বেইজিং কীভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা বা ‘হু’কে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

চিন সম্পর্কে এই যে অবিশ্বাস বা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগের সময়ও। যারা এতদিন লাল চিনের ‘প্রবল বন্ধু’ বলে পরিচিত ছিল, সেই নেপাল বা মালদ্বীপও চিনের ভ্যাকসিন নিতে চায় নি। নিঃসংশয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। নয়াদিল্লি শুধু যে প্রতিবেশী সব দেশে ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে তা নয়, চিনের যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বাসযোগ্য এবং ‘স্বহৃদয়’ বন্ধু হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নিজেদেরকে সামনে এনেছে। ২০২১ ঠিক করে দেবে নয়াদিল্লি বনাম বেইজিংয়ের টক্করে কে এগিয়ে থাকবে। ভারতকে আসলে তার গণতন্ত্র, পররাষ্ট্রনীতি এবং আভ্যন্তরীণ রাজনীতির উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, আমেরিকা যেটা গোটা বিশ্বের জন্য, ভারত এশিয়াতে সেই জায়গাটাই পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ ‘লিডার অব দ্য ফ্রি এশিয়া’। এটা নয়াদিল্লির জন্য সুবিধাজনক যে ভারত শুধু নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে তাই নয়, চিনের যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যেমন ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়া, তাদের সঙ্গেও চমৎকার সম্পর্ক তৈরি করেছে।

করোনার কারণে যেমন চিনকে নিয়ে অনেক রাষ্ট্রেরই সংশয় তৈরি হয়েছে, তেমনি করোনা মোকাবিলায় কে কতটা ভাল কাজ করেছে, সেটাও কিন্তু রাজনীতির বা রাষ্ট্র প্রধানের জনপ্রিয়তাকে নির্ধারণ করেছে। শুধু যে মার্কিন মুলুকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই কারণে নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন তাই নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও রাজনীতিতে ওলটপালট ঘটে গিয়েছে। যেমন ধরা যাক ইতালির কথা। ইতালির প্রধানমন্ত্রী গিউসেপ্পে কন্তেকে যে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ইস্তফা দিতে হল, তার কারণ কিন্তু করোনা মোকাবিলায় কোন পথ নেওয়া উচিৎ তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের মতভেদ। ইতালিতে যা নিয়ে বিরোধ বেঁধেছিল বা রয়েছেও তা ইউরোপের অনেক দেশের ক্ষেত্রেই সত্যি। প্রশ্নটা মূলত দুটো জায়গায়, প্রথমত করোনার সময় সরকার বা সরকারের প্রধান কীভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন, দ্বিতীয়ত করোনা অর্থনীতিতে যে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে তার মোকাবিলা কীভাবে করা হবে। ইতালির মত দেশে এই দুটো বিষয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ইতালিতে যেমন অনেক লোক মারা গিয়েছেন, তেমনই ইতালির অর্থনীতিও জার্মানির মত শক্তিশালী নয়। ইতালিতে এই বিতর্ক বা দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কৌশল না বলতে পারার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আপাতত ইস্তফা দিতে হয়েছে। তিনি যদি অর্থনীতির জন্য নতুন দাওয়াই বাতলাতে পারেন, তাহলে হয়ত রোমেও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ জন্ম নিতে পারে।

করোনা বিশ্ব অর্থনীতিকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে যে রাজনীতির অনেকটাই বদল হয়ে গিয়েছে। সেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে যতটা সত্যি, এশিয়ার ক্ষেত্রেও ততটাই বাস্তব। এমনিতেই সর্বদা চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা ইমরান খানের সরকার যেমন গত এক মাস ধরে এই টানাপোড়েনে থেকেছে যে ভ্যাকসিন নিয়ে কী হবে। নয়াদিল্লির প্রতিবেশীদের মধ্যে একমাত্র ইসলামাবাদের পক্ষে সম্ভব নয় করোনার ভ্যাকসিনের জন্য নরেন্দ্র মোদি বা ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে ফোন করা। তাহলে ইমরান খানের জন্য উপায় কী

ছিল? সেই বিন লাদেনের সময় থেকে পাকিস্তানের শাসকরা যেটা করে আসছেন, সেটাই করা, অর্থাৎ বেইজিংয়ের 'প্রভু'দের দিকে তাকিয়ে থাকা। এবারও ইসলামাবাদ সেটাই করেছে, কিন্তু চিনের থেকে অর্থ নেওয়া আর ভ্যাকসিন নেওয়া এক বিষয় নয়। একটা দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়, আর একটা নিজের শরীরে প্রয়োগ করতে হয়। করোনার দৌলতে চিনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে পাকিস্তানেও প্রবল ক্ষোভ বিক্ষোভ চিনা ভ্যাকসিন নেওয়া নিয়ে।

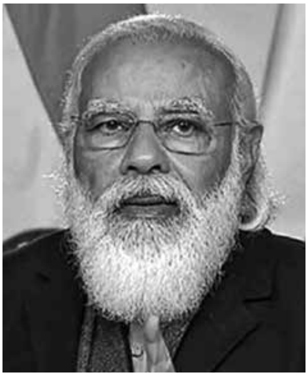

বেজিংকে টক্কর দিয়ে এশিয়ার কর্তৃত্ব দখল করতে পারবেন মোদি?

লক ডাউন, বাজারে মন্দা বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলোকেও এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে গেছে, যে অনেক রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক নেতাই নিজেদের দর্শন এবং পথের পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। বা আরও পরিস্কার করে বলতে গেলে নিজেদের উদগ্র এবং আগ্রাসী মনোভাবকে সংযত করে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' হাত বাড়িয়েছেন। যেমন ধরা যাক, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোগানের কথা। যিনি নিজেকে আধুনিক পৃথিবীর মুসলিম সমাজের 'খলিফা' বলে মনে করেন এবং অর্থনীতির জোরে প্রভাব কায়েম করার চেষ্টায় সদা ব্যগ্র, সেই তিনিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চিঠি পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই এর্দোগান যে শুধু ইমরান খানকে সঙ্গে নিয়ে মালেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহাথীর মহম্মদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ভারত বিরোধী অক্ষ বা ত্রিপাক্ষিক শক্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাই নয়, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো যখন তাঁর দেশে কট্টরপন্থী ইসলামকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়েছিলেন। গত এক দশক ধরে আসলে এর্দোগান একদিকে যেমন নিজেকে সৌদি আরবের 'প্রতিস্পর্ধী' বা মুসলিম দুনিয়ার নতুন 'খলিফা' হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছেন, একই সঙ্গে তাঁর এই রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে মানানসই সংস্কৃতি, অর্থাৎ সিনেমা, সিরিয়াল বা সাহিত্যকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এর্দোগানের এই চতুর প্রয়াসের জন্য তুরস্কের বিভিন্ন ওয়েব সিরিজ ভারতের কাশ্মীরে বা বাংলাদেশে মুসলিম তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এত জনপ্রিয়। কিন্তু করোনা তুরস্কের প্রেসিডেন্টকেও বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় এর্দোগানের ব্যর্থতা নিয়ে তুরস্কে তাঁর বিরোধীরা এমনিতেই সরব, তার উপরে ধাক্কা খেয়েছে অর্থনীতি। ফলে ইস্তামবুলের আধুনিক 'খলিফা'কেও নরম হতে হচ্ছে, ফরাসি পণ্য বয়কটের ডাক থেকে সরে এসে সখ্যতার 'সাবস্ক্রিপশন'কে রিনিউ করতে হচ্ছে। এর্দোগান হয়ত বুঝে গেছেন, তিনি নিজেকে যতই মুসলিম বিশ্বের 'মসিহা' প্রমাণ করতে ব্যগ্র থাকুন, খ্রিস্টান প্রভাবিত ইউরোপের সঙ্গে সংঘাত তুরস্ককে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করবে।

তাহলে যে শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটাকে যদি আবার ফিরে দেখা যায় তাহলে বিশ্ব রাজনীতি কোনদিকে হাঁটছে? বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রবণতা নিরীক্ষণ করলে মনে হয় একনায়কতন্ত্র বা যে কোনও 'এক্সিট্রিমিসম' চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সেটা মার্কিন মুলুকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদায় যেমন প্রমাণ করে, তেমনই চিনের আধিপত্যবাদের বিস্তারে বাধাও তারই সূচক। আবার এর্দোগানের পিছু হঠাও তারই ইঙ্গিত। আসলে করোনা অর্থনীতিকে এতটা ধাক্কা দিয়েছে যে কোনও নেতার পক্ষেই 'একনায়কতন্ত্র' চালিয়ে যাওয়াটা মুশকিল। করোনা পূর্ববর্তী পৃথিবীতে একনায়কদের বাঁধা স্লোগান ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যা যা করা দরকার, তা করতেই হবে, বেশি প্রতিবাদ বা সোজা বাংলায় 'ট্যা-ফোঁ' করা যাবে না। কিন্তু লকডাউন, মন্দা অর্থনীতিকে এমন বেহাল করে দিয়েছে যে এশিয়াতে তো বটেই, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে বহু লোক চাকরি হারিয়েছে। তাই লোকেও অনায়াসে বলতে পারছে, 'ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল দেওয়ার গোঁসাই', তুমি এলে কোথা থেকে!

বাঘ-কংগ্রেস কোচবিহারে কংগ্রেসের অগস্ত্য যাত্রার সূচনা করেছিল

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে কোচবিহারে ঘটে যাওয়া আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৭৪ সালের ২৭ আগস্ট। সেদিন দুপুরে জেনকিন্স স্কুলের মোড়ে দিনহাটার দিক থেকে কোচবিহারের দিকে এগিয়ে আসছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের একটি বাস। ঠিক সেই সময় মদনমোহন বাড়ির দিক থেকে এমজেএন স্টেডিয়ামের দিকে ছুটে আসছিল সিআরপি এফের একটি ভ্যান। মোড়ের মাথায় সিআরপিএফ ভ্যানটি প্রচণ্ড জোরে বাসটিকে ধাক্কা মারে। বাসের বেশ কয়েক জন যাত্রী এতে আহত হন। ভ্যানটিরও ক্ষতি হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েকজন সিআরপি জওয়ান ভ্যান থেকে নেমে এসে বাসের চালককে নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে। সে সময় স্কুলের টিফিন চলছিল। ছাত্ররা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে সিআরপিএফ জওয়ানদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। রাইফেল উঁচিয়ে ছাত্রদের দিকে তেড়ে আসে জওয়ানরা। বিপদের আশঙ্কা দেখে ছাত্রদের বাঁচাতে এগিয়ে যান শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক জওয়ান তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালাতে শুরু করে দেয়। পর পর দুটো গুলি এসে লাগে শঙ্করবাবুর শরীরে। নিমেষে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। পবিত্র বিদ্যা নিকেতনের সবুজ ঘাস নিমেষে ভিজে লাল হয়ে ওঠে শঙ্কর প্রসাদের বুকের রক্তে। গুলিতে আহত হয় শান্তি অসোয়াল ও প্রদীপ ঘোষ নামে আরও দুই ছাত্র। গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত সবাইকে মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উৎকণ্ঠিত ছাত্রদের ভিড়ে ভেঙে পড়ল গোটা হাসপাতাল চত্বর। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে পরদিন (২৮ আগস্ট) সবাইকে কাঁদিয়ে পরলোকে চলে গেলেন শান্ত নম্র বিনয়ী আদর্শ শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী।

বিনা দোষে নিরীহ মাস্টার মশাইয়ের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি কোমলমোতির ছাত্ররা। ক্ষুব্ধ ছাত্রদের ক্রোধের আগুন দাবানলের ছড়িয়ে পড়ল গোটা কোচবিহার শহরে। শুধু জেনকিন্স স্কুল নয় এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বই খাতা ফেলে সমস্ত স্কুল থেকে হাজার হাজার ক্রোধোন্মত্ত ছাত্র রাস্তায় নেমে এল। মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠল সাগর দিঘীর পার। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন প্রতিবাদী অসংখ্য মানুষজন। মুখে একটি মাত্র স্লোগান, 'শিক্ষক হত্যাকারি সিআরপি জোয়ানের বিচার চাই শাস্তি চাই'।

মিছিল পৌঁছে গেল সাগরদিঘীর পারে। ক্রোধন্মত্ত মিছিলের আগাম খবর পেয়ে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার আগেই দফতর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে দফতরে না পেয়ে এবার বিক্ষোভকারিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা ঢুকে পড়লেন দফতরের ভেতরে। ভীত সন্ত্রস্ত কর্মী আমলারা প্রাণ বাঁচাতে অফিস কাছারি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ভেঙে পড়ল গোটা শহরের প্রশাসন। শুরু

হয়ে গেল ভাঙচুর। আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। ছাত্রদের ভিড়ে ঢুকে গেল নানা শ্রেণীর মানুষ। এরপর আর ছাত্রদের হাতে আন্দোলনের রাশ ছিল না। অফিসের ফাইলপত্র, আদালতের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ভূমি নিবন্ধীকরণ ও ভূমি সংস্কার দফতরের বহুমূল্য দুর্লভ দলিল দস্তাবেজ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল ক্রোধের আগুনে। কার্যত রাজআমলের গরিমা মণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হারিয়ে গেল কোচবিহারের ইতিহাস থেকে। গোটা সাগরদিঘী স্কোয়ারের অফিস পাড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত নগরীর আকার ধারণ করল।

প্রায় এক পক্ষকাল ধরে তুষের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল ধবংস্তুপের আগুন। ছাইয়ের গাদায় ভগ্ন হৃদয়ে হারিয়ে যাওয়া অতীত খুঁজতে লাগলেন হতভাগ্য শহরবাসী। শুধু কোচবিহার শহরে নয়, শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল গোটা জেলায়। দিনহাটা, মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙ্গা শহরে এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএমের পক্ষ থেকে মিছিল বের হলে যুব কংগ্রেসের কিছু সমর্থক লাঠি সোটা নিয়ে সেই মিছিলে হামলা চালায়। এই হামলায় সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা আইনজীবি রেবতী ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়। শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিচারপতি তারাপদ মুখার্জিকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বিচারপতি তাঁর রিপোর্টে এই গুলিচালনার ঘটনাকে সম্পুর্ণ অযৌক্তিক বলে রায় দেন।

জরুরি অবস্থার সময় গোটা রাজ্যে গোষ্ঠী কোন্দলে ডুবে গেছে কংগ্রেস। সারা ভারত যুব কংগ্রেস সভাপতি তখন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। ইন্দিরার প্রস্তাব মত সঞ্জয় গান্ধীকে যুব কংগ্রেসের জাতীয় কাউনসিলের সদস্য করতে রাজি না হওয়ায় প্রিয়রঞ্জনকে সরিয়ে তাঁর জুনিয়র অম্বিকা সোনিকে সারা ভারত যুব কংগ্রেস সভাপতি পদে বসিয়ে দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি তখন দলে কোণঠাসা। দিল্লি থেকে এ রাজ্যের গোষ্ঠী কোন্দলকে মদত জোগাতেন ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধী। সঞ্জয়ের দাপটে তখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। বলাবাহুল্য এ রাজ্য থেকেও তার মোসাহেব জুটে গেল। তখন ক্ষমতাধীন প্রিয়-সুব্রতর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা সবাই গিয়ে সঞ্জয়ের হাত ধরলেন। এ রাজ্যের যুব ছাত্র রাজনীতির পাদ প্রদীপে উঠে এলেন লক্ষ্মীকান্ত বোস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আনন্দ মোহন বিশ্বাস, গোবিন্দ নস্কর, বারিদবরণ দাস, নূরুল ইসলামরা। আইএনটিইউসি-র পাশাপাশি গঠিত হল এনএলসিসি। ৭৩ এ ছাত্র পরিষদ থেকে আলাদা হয়ে গঠিত শিক্ষা বাঁচাও কমিটির নেতা নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যরাও সামিল হয়ে গেলেন প্রিয়-সুব্রত বিরোধী জোটে। প্রিয়-সুব্রত জোটে থেকে গেলেন অধ্যাপক সৌগত রায়, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহসভাপতি বিশ্বরঞ্জন সরকার, রাজ্য ছাত্র পরিষদ সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্যরা।

তবে এ রাজ্য তথা কোচবিহার জেলার চিত্রটা ছিল একটু অন্য রকম। কার্যত সন্তোষ রায়ের পদত্যাগের পর থেকে কোচবিহারে কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। গোষ্ঠী সংঘর্ষ বোমা পিস্তল ধরপাকড় এবং নিবর্তন মূলক আইনে বিনা বিচারে দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের মাসের পর মাস আটকের পর থেকে গোষ্ঠীপতিদেরও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। এবার নিউসিনেমার সামনে উঠে যাওয়া কোহিনূর বিড়ির বন্ধ ঘর ভাড়া নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরীর সমর্থকরা পৃথক দফতর খুলে বসলেন। যুব নেতা শ্যামল চৌধুরী, সবিতা রায়, রামকৃষ্ণ পাল, জ্যোতি শংকর (বাবু) ভট্টাচার্য, বীরেন কুণ্ডুরা ওই অফিসে বসতে শুরু করলেন। জমজমাট হয়ে উঠল নতুন কংগ্রেস অফিস। এ দিকে প্রাক্তন মন্ত্রী সন্তোষ রায়, প্রসেঞ্জিৎ বর্মন প্রমূখ জেলা কংগ্রেস নেতারা ধর্মসভার দোতলায় মূল কংগ্রেস অফিস থেকেই গোটা জেলা কংগ্রেস পরিচালনা করতেন। স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ ফজলে হক আর কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুনীল কর ছাড়া জেলার বাকি সমস্ত বিধায়করা তখন ছিলেন সন্তোষ রায়ের অনুগামী। জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সন্তোষ মুখার্জি আর জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি মিহির গোস্বামী দু জনেই তখন ছিলেন সন্তোষ রায়ের অনুগামী। তারাও তখন নিয়মিত

ধর্মসভা অফিসেই বসতেন। মন্ত্রীত্ব চলে যাবার পরও জেলা কংগ্রেস বলতে যা বোঝায় সেটা ছিল সম্পূর্ণ সন্তোষ রায়ের নিয়ন্ত্রণে।

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতের মত এ জেলাতেও কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণটি আগে থেকেই এই গোষ্ঠী কোন্দলের অনুকূল ছিল। তাই ৭৭-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরীকে হারাতে সন্তোষ রায়ের অনুগামীরা আদানুন খেয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। ওয়াংচু কমিশনে মন্ত্রীত্ব হারানোর বদলা নেওয়ার সুযোগ এত তাড়াতাড়ি হাতে এসে যাবে এটা সন্তোষ রায়ের অনুগামীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তাই প্রকাশ্যে ভোট ফর কংগ্রেস বললেও, জেলা জুড়ে গোপন সভা আর হুইসপার ক্যাম্পেনে 'হাতের' বদলে 'বাঘের' পেটে ছাপ দিতে সন্তোষ অনুগামীদের নিবিড় প্রচার অভিযানে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মাটি। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতীক চিহ্ন সিংহকে কোচবিহারের গ্রামগঞ্জের মানুষ বাঘ বলেই অভিহিত করে থাকে। তাই কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলে হাতকে ছাপিয়ে গেল বাঘ। একদিকে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি অন্য দিকে অন্তর্ঘাত এই দুয়ের যুগলবন্দীতে বিপুল ভোটে কংগ্রেসের বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরীকে পরাজিত করে কোচবিহার কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন ফরওয়ার্ডব্লক প্রার্থী অমর রায়প্রধান। বিনয়কৃষ্ণর এই পরাজয়ে সন্তোষ রায় অনুগামীরা আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে জনান্তিকে বলতে শুরু করলেন, "দেখবি আর জ্বলবি লুচির মত ফুলবি"। সেই থেকে বিনয়কৃষ্ণ শিবিরের চোখে সন্তোষ অনুগামীরা 'বাঘ কংগ্রেস' বলে চিহ্নিত হয়ে গেল।

কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকারের পতন হল। মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে দেশে গঠিত হল প্রথম কংগ্রেস বিরোধী সরকার। লোকসভাতে ভরাডুবির কয়েক মাসের মধ্যেই সাতাত্তরের জুন মাসে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হল। মানুষ এমনিতেই জরুরি অবস্থার দুর্বিষহ রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে ক্ষুব্ধ। তার উপর প্রেস সেন্সরশিপ আর সাংবাদিক নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে সমস্ত সংবাদপত্রও তখন চূড়ান্ত কংগ্রেস বিরোধী। এই চূড়ান্ত প্রতিকুল অবস্থাতেও কিন্তু কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল একবিন্দু কমল না। এবার কোচবিহার জেলায় গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ কংগ্রেসের এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর প্রার্থীদের পরাজিত করতে প্রায় প্রকাশ্যেই মাঠে নেমে পড়লেন। খাল কেটে কুমির আনার মত আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠল কংগ্রেস।

এর বিষময় ফলও মিলে গেল হাতে হাতে। ১৯৭৭ এর বিধানসভা আসনে জেলার সবকটি আসনেই পরাজিত হল কংগ্রেস প্রার্থীরা। কার্যত তখন থেকেই জন বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস গণ আন্দোলন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গিয়ে গোষ্ঠী রাজনীতিতেই নিজেদের নিমজ্জিত করে তুলল। রাজ্য কংগ্রেসের কিছু নেতা অবশ্য নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বামফ্রন্টের সাথে গোপন বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। বিচক্ষণ বিলেত ফেরত সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর মস্তিষ্ক প্রসূত এই খেলায় সুব্রত মুখার্জি, সোমেন মিত্রদের মত কিছু নেতা ওই দুরন্ত বাম জামানাতেও অনায়াসে জিতে যেতেন কলকাতার কয়েকটি আসনে। বামফ্রন্ট তাদের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রার্থী দিতেন আর প্রচারেও তেমন জোর দিত না।

কংগ্রেসের গোষ্ঠীপতি নেতারা বিধানসভার মধ্যেই তাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটা সীমিত রাখতেন। বাইরে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে তারা মোটেই উৎসাহিত ছিলেন না। এই বাঁটো অউর রাজ করো নীতিতে বামেদের সংসার সুখেই চলছিল। নিন্দুকেরা বলে, ১৯৮০তে ইন্দিরার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর বামেদের সাথে এ ধরনের একটা গোপন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। বামেরা এখানে বলতেন, লড়াই লড়াই লড়াই চাই। দিল্লি গিয়ে বলতেন, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই!

তবে ১৯৮৮ সালে বেহালায় ভেজাল সর্ষের তেল খেয়ে বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু ও পঙ্গু হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সংগঠিত প্রদেশ যুব কংগ্রেসের আন্দোলনকে ১৯৭৭-এর পর প্রথম উল্লেখযোগ্য বাম বিরোধী গণ আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি আর প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন প্রদ্যোত গুহ।

ওই আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায় কোচবিহারে। জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি তখন যুব নেতা মিহির গোস্বামী। ১৯৮৮ সালের ৪ আগস্ট তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার যুব কংগ্রেস সমর্থক সামিল হলেন শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য কর্মসূচিতে। ধর্মসভার কংগ্রেস দফতর থেকে মিছিল বেরিয়েছিল। সুনীতি রোড ধরে সেই মিছিল ক্রমেই এগিয়ে যায় জেলা জজ কোর্টের সামনে। সেখান থেকে সাগরদিঘীর পশ্চিম পার ধরে মিছিল চলে যায় জেলা শাসকের দফতরে। মিহির গোস্বামীর নেতৃত্বে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে সাগরদিঘীর দক্ষিণ-পূর্ব পার ধরে মিছিল চলে আসে সদর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আর খাদ্য মন্ত্রী নির্মল বসুর কুশপুতুল পড়ানো হয়। মিছিলে মিছিলে কার্যত সেদিন গোটা সাগরদিঘীর পার অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী যুব কংগ্রেস নেতারা স্মারকলিপি দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মহকুমা শাসকের কাছে। প্রথমে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। তার পর লাঠি চার্জ শুরু করে। মিছিলের ব্যাপ্তি আর একাগ্রতা দেখে পুলিশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে। এই সময় কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই হঠাৎ করে পুলিশ গুলি চালিয়ে দেয়। কাঁদানে গ্যাসের একটি শেলও ফাটানো হয় নি। গুলি চালানোর আগে একবারও সতর্ক করা হয় নি আন্দলোনকারীদের। সরাসরি গুলি চলে রাইফেল থেকে। এমনকি সার্ভিস রিভলবার থেকেও একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি চালাতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চলে। গুলিতে লুটিয়ে পড়ে যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিমান দাস ও কর্মী রবীন চন্দ। গুরুতর আহত হন মুরারী বর্মন, নীরদ দাস, হায়দার আলি। আহত হন কেশব রায়, ভারত রায়, শীতল রায়, প্রভাত রায়, অজিত দত্ত, গোপাল দাস প্রমুখ। দ্রুত সবাইকে এমজে এন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎকরা বিমান দাস, রবীন চন্দ আর হায়দার আলিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুরারী বর্মন, নীরদ দাশকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

হাসপাতালে ছুটে যান জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রসেঞ্জিৎ বর্মন সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। পরদিন কোচবিহারে ছুটে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। এরপর কোচবিহারে আসেন সন্তোষ রায়, অপূর্ব লাল মজুমদার, প্রদ্যুত গুহ প্রমুখ নেতারা। পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে গোটা কোচবিহার শহরে অঘোষিত বন্ধ শুরু হয়ে যায়। পাঁচ আগস্ট জেলা কংগ্রেস দফতর থেকে শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে কোচবিহার শহরে শোক মিছিল বের করা হয়। গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোচবিহারের নাগরিকদের এক সভায় গুলি চালনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। কবি রণজিৎ দেব, অধ্যাপক উষাকান্ত দত্ত সহ শহরের বিশিষ্ট জনেরা এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। শিল্পী পবিত্র দাশের প্রচ্ছদে জ্বালাময়ী কবিতা ও গদ্যে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় ‘রক্তাক্ত সাগরদিঘী’ নামে একটি প্রতিবাদ পুস্তিকা। এই গণহত্যা থেকে মুখ লুকাতে বাম সরকার শহীদ বিমান দাসের পিতা আর রবীন চন্দের পরিবারকে দশ হাজার টাকা করে ক্ষতি পূরণ দিতে চাইলে উভয় পরিবারই ঘৃণা ভরে সেই ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখান করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে হায়দার আলির মৃত্যুকে সরকারি ভাবে স্বীকার করা হয় নি। সে যাই হোক, রক্তের অক্ষরে সাক্ষী হয়ে আছে বাম আমলে পুলিশি গণহত্যার এক নির্মম ইতিহাস।

কংগ্রেসের গোষ্ঠীপতি নেতারা বিধানসভার মধ্যেই তাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটা সীমিত রাখতেন। বাইরে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে তারা মোটেই উৎসাহিত ছিলেন না। এই বাঁটো অউর রাজ করো নীতিতে বামেদের সংসার সুখেই চলছিল। একটা গোপন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল।

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

গত চার দশকে ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কতটা বদল এনেছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক? কতটা এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে? প্রত্যন্ত উত্তরবাংলার দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগানো ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে যেটুকু বদল ঘটেছে তা একদিনে হয় নি, ব্যাংক কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তা তিলে তিলে হয়েছে। ক্রমে উত্তরের গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে এই ব্যাংকটির যে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে আজ কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাংক মানে শুধুই কি ডেবিট-ক্রেডিট-পাসবই আর লোন? উত্তরবঙ্গের এই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মীরা কিন্তু বলেন তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। কিন্তু পিছিয়ে পড়া উত্তরের বিবর্তনের পথে সেসব কথাগুলি কি কোথাও লেখা রইবে না? অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মী ও এই ব্যাংকের প্রথম নিজস্ব ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রশান্ত নাথ চৌধুরী এবার থেকে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলেন তাঁদের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের গোড়া থেকে গড়ে ওঠার গল্প। স্মৃতি হাতড়ে বের করে আনছেন নানান টুকরো টুকরো কথা ও কাহিনী।

এক

একযুগ আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। বহু বর্ণময় স্মৃতি কালের অমোঘ নিয়মে ঝাপসা হয়ে গেছে। বেশ কিছু চরিত্র বা ঘটনা এই লেখায় স্থান পাওয়া আবশ্যক ছিল কিন্তু তার অনেক কিছুই আর মনে নেই। স্মরণের কোণ থেকে ছেঁড়া পাতা জুড়েই এই লেখা। চেষ্টা করেছি অনৃত শব্দগুচ্ছ সরিয়ে রাখতে কিন্তু ঘটনার ঘনঘটায় আগের কথা পরে, পরের কথা আরও পরে লেখা হয়েছে। চেষ্টা করছি আমার তিরিশ বছরের ব্যাঙ্ক জীবনের পথ চলার কথা ধরে রাখতে তবে যাদের সাধুতা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে তাদের কথা বলতে পারি নি। এখানেই আমার লেখার সীমাবদ্ধতা।

১৯৭৭ সন। ফুরফুরে ব্যাচেলর জীবন। ইরিগেশন দপ্তরে নিশ্চিন্তির চাকরি। অফিসে কাজ কম, বেশি ছিল বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, সঙ্গে তাস, টেবিল টেনিস, ভলিবল খেলা, রাত জেগে চলন্তিকা পাঠাগারের বই গেলা, আর চুটিয়ে বাড়িতেই টোল খুলে মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী পড়ানো। হঠাৎ একদিন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার লালকাকা বললেন "কোচবিহারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে লোক নিচ্ছে, তুই অ্যাপ্লাই কর"। প্রথমেই বড় একটা খটকা— ওটা আবার কেমন ব্যাঙ্ক, নাম

পর্যন্ত শুনি নি, চোখে দেখা তো দূরের কথা। স্থানীয় পত্রিকা 'ত্রিস্রোতা'-তে নিয়োগের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। লালকাকার তাগাদায় দরখাস্ত পাঠালাম, কিন্তু পরীক্ষার সাড়াশব্দ নেই। শুনলাম আদালতে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের আবেদন জানিয়ে মামলা করা হয়েছিল। ক্রমে সেই দরখাস্তের কথা ভুলেই গেলাম।

তারপর বছর দুয়েক পেরিয়ে গেছে। সে সময়টায় নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আইন কলেজে সন্ধ্যায় পড়াশুনোও করি। ইরিগেশন দপ্তরের সুপারিনটেনন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আমায় আইন কলেজের বাস ধরার জন্য বিকেল চারটায় ছুটি অনুমোদন করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের বর্ষাকালে একদিন ডাকযোগে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চিঠি এল, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি কলেজে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে।

সেই বছর আমি আইন কলেজে ফাইনাল ইয়ারে। নানা কারণে নিয়মিত হাজিরা দিতে পারি নি, ফলে ডিস-কলেজিয়েট হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সমস্যার সমাধান নিয়ে উদগ্রীব ছিলাম। ব্যাঙ্কের পরীক্ষার দিনই সকালে খ্যাতিমান আইনজীবি বামপন্থী নেতা অধ্যাপক পরেশ মিত্র মশায়ের বাড়িতে গিয়ে আমার আইন কলেজের সমস্যা খুলে বললাম। পরেশদা অসাধারণ ছাত্র দরদী ছিলেন। রাগী অথচ প্রশ্রয়ের গলায় বললেন "তোরা আমার মুখ ডোবাবি। ক্লাস না করলে কিছুতেই রেজাল্ট ভাল করতে পারবি না। ভাল করে পড়াশোনা করে যা। পরীক্ষা দিতে অসুবিধে হবে না।" নিশ্চিন্ত হয়ে এবার শিলিগুড়ির বাস ধরলাম। কিন্তু পরীক্ষা হলে পৌঁছলাম প্রায় পনের মিনিট দেরিতে, যাহোক হাতে পায়ে ধরে হলে ঢুকলাম। তখন আমি নিয়মিত মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী পড়াই, প্রশ্নপত্রের অঙ্ক আর ইংরাজি আমার কাছে জলভাত। সাধারণ জ্ঞান যদিও সামান্য খটমটে ছিল। পরীক্ষা হয়েছিল এন.আই.বি.এম-এর পরিচালনায়।

কিছুদিন পরেই আমাকে কোচবিহারে ইন্টারভিউতে ডাকা হল সকাল দশটায়। তার মানে আগের দিন জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহারে গিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু ইন্টারভিউর আগের দিন আমার আইন পরীক্ষার শেষ দিন, তখন আর কোচবিহারের বাস নেই। আমি ঘটনাটি জানিয়ে ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়ে জানালাম ইন্টারভিউতে পৌঁছাতে কিছু দেরি হতে পারে। প্রবল বর্ষণমুখর দিনে বেলা ১১টায় আমি উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তল্লিতলার হেড অফিসে পৌঁছলাম। গেটে দাঁড়িয়ে যিনি প্রার্থীদের ডাকছিলেন তাঁকে নিজের নাম জানিয়ে বলেছিলাম আমার আসতে একটু দেরি হবে তা আমি আগেই জানিয়েছিলাম। উনি বললেন "জানি। এর পরেই আপনি ভেতরে যাবেন। এখানেই থাকুন"। পরে উনি জানিয়েছিলেন আমি নাকি লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। ইন্টারভিউ আশাতীত ভাল হয়েছিল। সাত-দশদিন পরেই নিয়োগ পত্র হাতে পেলাম।

আমার মা বলতেন সরকারি চাকরির সম্মান বেশি। তিনি চাইছিলেন না আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে একটা অনামী ব্যাঙ্কে চাকরি নিই। চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে অনেক শুভানুধ্যায়ীও বিপক্ষে ছিল। প্রত্যেকের কাছে শুনেছি এককথা "এ ব্যাঙ্কের নামই শুনি নি। সরকারি পার্মানেন্ট চাকরি কেউ ছাড়ে নাকি?" আমি লালকাকাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর মুখেই শুনলাম "গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জন্মলগ্ন থেকেই 'পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক'। ভারত সরকার এক অধ্যাদেশ জারি করে ২রা অক্টোবর ১৯৭৫-এ সারা দেশে ৫টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। তার একটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহের গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। পরে ভারত সরকার ১৯৭৬ সনে সংসদে আইন পাশ করে 'রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ১৯৭৬' যার ভিত্তিতে সারা দেশে

ব্যাঙ্কটির উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৭৭ সনের ৭ই মার্চ। আমরা জয়েন করার আগে ব্যাঙ্কের দুটি শাখা ছিল জলপাইগুড়ি জেলায় বেরুবাড়ি, ওদিকে কোচবিহার জেলায় নিশিগঞ্জ। ওই শাখা দুটিতে (দিন হাজিরার সুইপার কাম মেসেঞ্জার ছাড়া) সবাই ছিলেন স্পনসর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডেপুডেট কর্মচারী।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সাধারণত যে জেলায় যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 'লিড ব্যাঙ্ক'-এর দায়িত্বে তারাই স্পনসর ব্যাঙ্ক হিসেবে এক বা একাধিক জেলাকে বিধিবদ্ধ কর্মক্ষেত্র (নোটিফায়েড এরিয়া) চিহ্নিত করে ব্যাঙ্ক স্থাপন করে শাখা বিস্তার করছিল। যেমন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এই তিন জেলাকে নোটিফায়েড এরিয়া করে কাজ শুরু করেছিল উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে লালকাকার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনিই বলেছিলেন "এই ব্যাঙ্কের তিনজন শেয়ার হোল্ডার— (১) ভারত সরকার ৫০ শতাংশ, (২) রাজ্য সরকার ১৫ শতাংশ এবং (৩) স্পনসর ব্যাঙ্কের শেয়ার ৩৫ শতাংশ। পাবলিক সেক্টার ব্যাঙ্ক তাকেই বলা হয় যার বেশির ভাগ শেয়ার থাকে সরকারের হাতে। ওনার উৎসাহতেই আমি ২০শে আগষ্ট ১৯৭৯ তারিখে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিজস্ব প্রথম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করি। সেদিন অফিসে শুধুমাত্র একজন মহিলা কর্মী অফিসে ছিলেন। তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দাস অফিসের কাজে বাইরে ছিলেন। সেই মহিলা কর্মী শ্রীমতি বহ্নিশিখা মজুমদার ছাড়া অফিসের ড্রাইভার প্রয়াত বাদল সাহা কর্মরত ছিলেন। আমি জয়েন করেছিলাম ব্যাঙচাতরা রোডের সেই তল্লিতলার অফিসে।

ব্যাঙ্কটির উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৭৭ সনের ৭ই মার্চ। আমরা জয়েন করার আগে ব্যাঙ্কের দুটি শাখা ছিল জলপাইগুড়ি জেলায় বেরুবাড়ি, ওদিকে কোচবিহার জেলায় নিশিগঞ্জ। ওই শাখা দুটিতে (দিন হাজিরার সুইপার কাম মেসেঞ্জার ছাড়া) সবাই ছিলেন স্পনসর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডেপুটেড কর্মচারী। চেয়ারম্যান সাহেব পরদিন এসে অনেকটা সময় আলোচনার পর বললেন "আমাদের কাছে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ কয়েকটি লাইসেন্স দিয়েছে। সময়মত ব্রাঞ্চ না খুললে লাইসেন্স বাতিল হবে।" তিনি আরও বললেন "নিশিগঞ্জে দশদিন ট্রেনিং নিতে হবে তারপর জামালদহ গিয়ে ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের প্রচার চালাতে হবে। পনের দিন পরে জামালদহ ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করা হবে। কাল থেকেই নিশিগঞ্জ যেতে হবে।"

নিশিগঞ্জে তখন টুলুদা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, অমল মাহাতো ফিল্ড অফিসার ও সুশান্ত চৌধুরী ক্যাশিয়ার। প্রথমদিন সুশান্তর পাশে বসে টাকা পয়সা লেনদেন দেখলাম। পরদিন অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম কানুন, বিভিন্ন টার্ম ডিপজিট সম্বন্ধে জানলাম। কয়েক দিনের মধ্যে স্ক্রল, টোকেন, সাপ্লিমেন্টারি ক্যাশ বুক, ক্যাশ বুক, জিএল, জিএলবি ইত্যাদি চিনেছিলাম। অমল ছিল এগ্রিকালচারের ছেলে মানে এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েট, ওর আছেই শস্য ঋণ, এগ্রিকালচার টার্ম লোন ভাল ভাবে শিখতে চেষ্টা করেছিলাম। নিশিগঞ্জের দিন-হাজিরার কর্মী রমেশ দেবনাথ আমাকে ভাউচার চিনিয়েছিল।

আর.আর.বি অ্যাক্ট ১৯৭৬ বলেছিল এই ব্যাঙ্ক তার নোটিফায়েড এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন কৃষকদের এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কুটির ও হস্তশিল্পীদের ঋণ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে। তা ছাড়া এই ব্যাঙ্ক সমস্ত রকম আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। আমরা যখন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার রূপে ব্যাঙ্কিং দুনিয়ায় পা রাখছি সে সময়টায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্রপটে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে মোরারজী দেশাই-এর জনতা দল ভারত শাসন করছিল। শাসকদল ভেবেছিল এমন অপ্রতুল পরিকাঠামো নিয়ে এটা আসলে ব্যাঙ্ক নয় হয়ত পূর্বতন সরকারের গ্রামে অস্তিত্ব কায়েম রাখার একটা মাধ্যম। তাদের সন্দহ দৃঢ় হয়েছিল কারণ ব্যাঙ্কটির জন্মলগ্নে ইন্দিরা সরকারের মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সরাসরি এর গঠন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ছিলেন। তৎকালীন সরকার প্রফেসর এম.এল.দান্তেওয়ালার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে বলেছিলেন "গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দেখে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ওরা পেশ করবেন।" দান্তেওয়ালা কমিটি তার রিপোর্টে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সমাজের দুর্বলতম মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতার চিত্র তুলে ধরেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতি তাদের দৃষ্টভঙ্গি পালটে আরও ব্যাঙ্ক স্থাপন ও শাখার উদ্বোধনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আমাদের গ্রাহক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল আর্থিকভাবে দুর্বলশ্রেণির মানুষ, যারা হয়ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো থেকে

সঠিক পরিষেবা পাচ্ছিল না।

তখন নিশিগঞ্জ মানে দু-চারটে দোকান, কিছু তাঁতশিল্পী ও কৃষিপণ্য বিপননের হাট মাত্র। হাটের মাঝে একটি লোক টকটকে লালবর্ণের মুরগির মাংস বানাত, সেই দোকানের গরমভাত আর রগরগে মুরগির ঝোলের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। তখন নিশিগঞ্জের নামডাক ছিল হাড়ভাঙ্গার গ্রামীণ চিকিৎসক মুসুরী বদ্যির জন্য। এখন নিশিগঞ্জের যে ব্যাপক সমৃদ্ধি তার পেছনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

নিশিগঞ্জের অল্পদিনের ট্রেনিং পরবর্তীকালে সবসময় কাজে লেগেছে। জামালদাতে আমরা তিনজন নিযুক্ত হয়েছিলাম পিনাকী (পিনু) চক্রবর্তী ফিল্ড অফিসার কাম অ্যাকাউন্টটেন্ট, তপন ঘোষ ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার, প্রদীপ সাহা সুইপার কাম মেসেঞ্জার এবং আমি। এর কিছুদিন আগেই সঞ্চয়িতা নামে এক চিট ফান্ডের গণেশ উল্টেছে। আমাদের শাখার চেহারা ছবি দেখে অনেকেই ভাবছিলেন আমরাও হয়ত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটাবো, কিন্তু তা হলো না। পাঁচ টাকা জমা দিলেই সেভিংস বই খোলা যায় বা পাঁচ টাকা দিয়েই একটা রেকারিং ডিপোজিটের বই খোলা যেত। সময় লাগল, কিন্তু কী করে যেন খুব তাড়াতাড়ি আস্থা অর্জন করে ফেলল গ্রামের গরীব মানুষদের।

জামালদা শাখার উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৭৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফিতে কেটে ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করেছিলেন। আসা যাওয়ার পথে প্রদীপ দাস, চেয়ারম্যান জামালদহে প্রায়ই আসতেন। আমাদের মেসের পাশেই এক ভদ্রমহিলাকে মাসিমা ডাকতাম। চেয়ারম্যান এলেই তাঁর বারান্দায় পাত পেড়ে ডিমের ঝোল ভাত খাওয়া হত। মেসে রান্নার মাসি না এলেই চিৎকার করে মাসিমার কানে রান্নার মাসির অনুপস্থিতি ঢোকান হত। ঘণ্টা খানেক বাদেই খাওয়ার জন্য মাসিমার ডাক আসত।

একটা কথা মনে পড়ছে। নতুন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। আমার পরিচিত তপন একদিন বলেছিল তার প্রাইভেট ফার্মে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। একদিন প্রদীপ দাস এসেছিলেন, কাজ সেরে গাড়িতে ওঠার সময় তাকে বললাম "তপন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পোস্টের জন্য দরখাস্ত করতে চায়, ওর এক্সপেরিয়েন্স আছে। ওকে পরীক্ষায় বসার একটা সুযোগ দিতেই হবে।" বেশ কিছু কথাবার্তার পর উনি দরখাস্ত বিবেচনা করতে রাজি হলেন। তপন পরীক্ষায় পাশ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে যোগদান করে এবং চিফ ম্যানেজার পদে আসীন অবস্থায় অবসর গ্রহণ করে। তপনকে অনেকেই কিপটে বলতে পারে তবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে যোগদানের পর ও আমাকে ভালবেসে একটা স্যুট লেন্থ উপহার দিয়েছিল। এখন যোগাযোগ কম তবে দেখা হলেই প্রচুর আড্ডা হয়।

জামালদা মেসে তাস (ব্রীজ) খেলার আকর্ষণে কিছু মানুষজনের আনাগোনা ছিল। ওরা নতুন গ্রাহক জোগাড়ে বেশ সাহায্য করত। এমনও হয়েছে কোনও দিন শাখায় কেউ লেনদেন করতে আসেন নাই। তপন দশ টাকা জমা করে আমাকে বা পিনুকে দিয়ে দশ টাকা উইথড্রয়াল করিয়ে সেদিনের ক্যাশ বুকে তার প্রতিফলন ঘটাত অর্থাৎ দিনটা নিষ্ফলা যেত না। মাঝে দু-একবার কোচবিহারে গেছি, কৃষি ঋণ দেওয়ার নিয়ম কানুন নিয়ে দীর্ঘ সময় চেয়ারম্যান প্রদীপ দাস মশায়ের সঙ্গে আলাপ করেছি। তবে এটা বুঝেছিলাম কৃষি ঋণের চাইতে অন্য ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া বেশ সহজ।

জামালদায় শ্যামলবাবুর একটা চালু মিষ্টির দোকান ছিল। ওর দোকানের সিঙ্গারার তরকারি দিয়ে বহুদিন দুপুর ভাত খেয়েছি। শ্যামলবাবুকে অনেক বুঝিয়ে দু-হাজার টাকা লোন দিয়েছিলাম। স্থানীয় মানুষ সুনীল বাবু আমাদের তাস খেলার বন্ধু ছিলেন তাকেও একটা ঋণ দেয়া হল। আমরা যে লোন দিতে পারি সেটা বোঝাতেই ঋণ দেওয়া। ওরা দুজনেই অকালে আমাদের ছেড়ে অন্যলোকে চলে গেছেন ওদের স্মৃতি রয়ে গেছে।

একদিন কিছু জরুরি স্টেশনারী আনতে কোচবিহার গিয়েছিলাম, চেয়ারম্যান সাহেব ডেকে বললেন খুব তাড়াতাড়ি প্রায় কুড়িটি নতুন শাখা খুলতে হয়েছে, আরও কিছু শাখা খুলতে হবে। আমাকে হেড অফিসে কাজের জন্য ডাকলেন। জামালদায় ফিরে গিয়ে খবরটা বলতেই আমাদের টিমের মন খারাপ। কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রান্সফার অর্ডার হাতে চলে এল। কোচবিহার চললাম, নতুন ধরনের কাজ, নতুন দায়িত্ব।

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?

টোটোপাড়া বারবার

শৌভিক রায়

হান্টাপাড়া পার হতেই উত্তরে দেখা গেল হিসপা-কে। আর পশ্চিমে চোখ ফেরাতে নজরে এল পদুয়া। অবশ্য এখান থেকেও গন্তব্য একেবারে কম দূর নয়। দাম্পি আর দ প্রুঙকে দেখতে হলে অবশ্য এখনও চলতে হবে আরও খানিকটা পথ। এমনিতে বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর অবধি রাস্তা এখন ঝকঝকে কালো পিচের। তারপর পাথুরে ধুলো মাখা পথে আরও গেলে অবশেষে তাদিং পাহাড়ের কোলে বিস্ময়কর ছোট্ট সেই জনপদ। পদুয়া আর হিসপা পাহাড় দুটি এখানকার মূল বাসিন্দাদের কাছে দেবতার মত পবিত্র। চারপাশের এই পাহাড়গুলি থেকেই নেমে এসেছে দাতিঙতি, হাউড়ি, কাংদুতি, দীপ্তি, চুয়াতি, নিটিংটি, জৈপ্তি, গোয়াতি, নামতিতি ও মুটি নামের ঝোরাগুলি। আপাত শান্ত এই ঝোরাগুলিই বর্ষায় আকুলিবিকুলি করে চারপাশ এমন ভাসায় যে, প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই ছোট্ট গ্রামটি! সমগ্র ডুয়ার্স এত সুন্দর যে, আলাদা করে এই জনপদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করবার প্রয়োজন হয় না। আর সত্যি বলতে, প্রকৃতিপ্রদত্ত রূপমাধুরীর জন্য নয়, এই জনপদের পরিচিতি তার বাসিন্দাদের জন্য। অবশ্য পাকদন্ডী রাস্তা, হাউড়ি-তিতি-তোর্ষা নদী, দিনের বেলায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের ছমছমে জঙ্গল, অদূরের ভুটান পাহাড়, সাপ্তাহিক হাটে রঙচঙে মানুষজন এবং সুপারি আর কমলালেবু বাগান ঘেরা জনপদটির টান প্রবল। সঙ্গে আছেন এখানকার মানুষেরা যাদের জন্য সেই কবে থেকে ছুটে আসছেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেমন, তেমনি আসছেন আমার মত অর্বাচীন মানুষেরাও। মাদারিহাট ব্লকের টোটোপাড়ার মাহাত্ম এমনই!

আশির দশকে প্রথম যখন যাই সেখানে, তখন পথঘাট ছিল দুরূহ। ঝাঁকুনিতে শরীরের কলকব্জা খুলে আসার উপক্রম! টোটোপাড়ার আরণ্যক পরিবেশে তখন আক্ষরিক অর্থেই গা ছমছম করত। মাদারিহাট থেকে চব্বিশ কিমির সম্পূর্ণ রাস্তা ছিল পাথুরে। যোগাযোগের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি ছাড়া সেভাবে কিছুই ছিল না। দেখা যেত পান সুপুরি চিবোতে থাকা স্থানীয় মানুষদের। তাদের চোখে সমতলের মানুষদের জন্য লেগে থাকত বিস্ময়। অবশ্য এমনটা নয় যে, তারা সমতলের মানুষদের দেখেন নি। বহুদিন আগেই তাদের আবিষ্কার করেছিলেন ইংরেজরা। তবু নিজের মনে প্রশ্ন জাগে যে, ১৮৯০ সালে যখন সান্ডার সাহেব জমি জরিপ করছিলেন তখন তিনি জানতেনই না কী আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন!

মনে করা হয় যে, লুপ্তপ্রায় জনজাতি টোটোরা একসময় ভুটান-রাজের মালবাহকের কাজ করত। ভারবহনের সূত্র ধরেই তারা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। ভারত-ভুটান যুদ্ধে ভুটানের পরাজয় হলে বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী টোটোরা ভুটানের নানা জায়গায় আশ্রয় নিলেও, টোটোপাড়ার টোটোরা সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের গ্রামে থেকে যান। কেননা তারা ভেবেছিলেন তাদের গ্রামটি ভুটানের অন্তর্ভুক্ত। সে ভুল ধরা পড়ে একসময়। এই ছোট্ট গ্রামটি ভারতের বলেই পরিচিতি পায় ও টোটোরা ভারতীয় হিসেবে গণ্য হন। তথ্য বলছে যে, ১৮৮৯ সালে যে টোটোদের সান্ডার সাহেব

দেখেছিলেন, তার দেখা টোটোরা, টোটোপাড়ায় সাত-আট পুরুষ আগে এসেছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, তারও আগে মালবাজারের টটগাওঁ, আলিপুদুয়ারের টটপাড়া ইত্যাদি জায়গায় টোটোদের বসতি ছিল। অনেকের মতে, কোচ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে এই অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার 'ডয়া' নামের এক ভুটানি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধবিগ্রহ তাদেরকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছিল বলেও অনেকের অনুমান। কারণ যেটাই হোক, আজকের টোটোপাড়া কিন্তু জগৎবিখ্যাত একটিই কারণে আর সেটা হল এখানকার মানুষেরা। পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি উপজাতি ও ৩টি আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে টোটোরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত এবং তাদের হাত ধরেই টোটোপাড়া বিশ্বজগতে স্থান করে নিয়েছে। আজকের টোটোপাড়া দুমসি গাওঁ, পূজা গাওঁ, মিত্র গাওঁ, সুব্বা গাওঁ, মন্ডল গাওঁ ও পঞ্চায়েত গাওঁ নিয়ে গঠিত। এ বাদেও হাউরি লাইন, হাসপাতাল লাইন, চানবা লাইন, স্কুল লাইন, পরগাওঁ, পাখাগাওঁ, তাদিং ইত্যাদি ভাগেও ভাগ হয়েছে টোটোপাড়া। টোটো সম্প্রদায়ের নামের বিবর্তন হিসেবে বলা হয় যে, জেপাঙ থেকে এই শব্দের সৃষ্টি। জেপাঙ থেকে জিতেন - টোটাভি- টোটা - টোটো এভাবেই বিবর্তিত হয়েছে শব্দটি।

একসময় টোটোপাড়া সন্নিহিত পাহাড়ে কমলালেবুর ফলন ছিল চোখে পড়ার মত। এখানকার মানুষদের মূল জীবিকাই ছিল কমলালেবু সংগ্রহ করা। পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও টোটোপাড়ার অর্থনীতি কমলালেবুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। সমতল থেকে ব্যবসায়ীরা এসে সেই কমলালেবু কিনে নিয়ে যেতেন। শোনা যায় যে, তারও বহু আগে ইংরেজ

আমলে, একটি দুটি সিগারেটের বিনিময়েও নাকি বানিয়া ইংরেজ সংগ্রহ করত ডুয়ার্সের সুস্বাদু কমলালেবু। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজ আর কমলালেবু বাগান নেই। ফলে, টোটোপাড়ার অর্থনীতির অভিমুখ আজ বদলে গেছে। কিছুদিন আগেও সেই অর্থনীতিতে এখানকার মাটিতে জন্মানো স্বাভাবিক বাঁশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিত। কিন্তু কমলালেবুর মত সেখানেও অজানা রোগ হানা দিয়ে ফলন বন্ধ করেছে। ফলে আজকের টোটোপাড়ার বাসিন্দাদের মূল কাজ কৃষিকাজ এবং এই কৃষিতে সুপারির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এখানকার মাটিতে সুপারির অধিক ফলন হেতু এখানে প্রচুর পরিমানে সুপারি চাষ হয়। এরকমই এক কৃষিজীবী টোটো পরিবারের সন্তান অভিষেক টোটো জানালেন যে, বছরে তারা ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা প্রতি কেজি হিসেবে প্রায় লাখ দুয়েক টাকার সুপারি উৎপাদনে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, অভিষেক কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে বীরপাড়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে টোটোপাড়াতেই একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তার এক দিদিও টিসিএসে কর্মরত। ভাই বিপ্লব টোটোও অভিষেকের মত বিএ পাস করেছেন। আজকের টোটোপাড়ায় অবশ্য বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মোটামুটি সব সুবিধে রয়েছে। ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৫৬ জন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী মিশা ঘোষাল রায় জানালেন যে, তাঁর বিদ্যালয়ে মোটামুটি সব পরিকাঠামো থাকলেও শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তবে সকলের সাহায্যে সেই অসুবিধে অচিরেই দূর করা যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। টোটোরা ছাড়াও গ্রামে নেপালি, রাজবংশী, বিহারি ও কিছু সংখ্যক বাঙালি রয়েছেন।

নব্বইয়ের দশকের শেষেও কিন্তু টোটোপাড়ার চেহারা ছিল আলাদা। আজকের মত এত সংখ্যক বাড়িঘর ও মানুষজনের দেখা পাওয়া যেত না সেখানে। আজ প্রায় ৫০০০ লোকের বাস টোটোপাড়ায়। অসমর্থিত সূত্র অনুসারে এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৬০৩ হলেন টোটো সম্প্রদায়ভুক্ত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অতীতের সেই সামাজিক জীবনেও এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। টোটোদের নামকরণে বাংলা, নেপালি শব্দের প্রয়োগ তার প্রমাণ। এখন শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, তাদের বিয়ে হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাদের জীবনে বদল আনলেও এখনও টোটো সম্প্রদায় ১৩টি গোত্রে বিভক্ত— বঙ্গবি-বে, বৌদুবি-বে, বুদুবি-বে, নুরিং-চানকোবে, দিড়িঙ-চানকোবে, পিশু -চানকোবে, নুবি-বে, রেংকাই জি-বে, দাংকোবে, দাংত্র বি, মাংকোবি, মাংত্র বি, মাং-চি-বি। স্বগোত্রে বিয়ে সাধারণত দেখা যায় না টোটো সমাজে। বিয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদার হলেও, নিজের গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ে বিয়ে করতে হলে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন রয়েছে টোটো সমাজে। অনেক সময় সন্তান আসবার পরেও বিয়ের অনুষ্ঠান চলে ‘বিয়ো পং-পেওয়া’-এর মাধ্যমে। কিন্তু বিবাহিত দম্পতির কেউই বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। বিয়ের পর নবদম্পতির জন্য আলাদা ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়।

টোটোদের বাসগৃহ নির্মাণেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বাঁশ বা কাঠের খুঁটির ওপরে খড়ের দোচালা ছাউনি দিয়ে তাদের ঘর নির্মিত হয়। তাদের ভাষায় এই ঘরের নাম হল ‘না কে শা’। ঘরে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র দরজা বা ‘লাপুঙ’ থাকে। সাধারণত মাটি থেকে পাঁচ-সাত ফুট উচ্চতায় ঘরের মেঝে তৈরি করা হয়। দরজার সামনে থাকে উন্মুক্ত বারান্দা, মেঝের উচ্চতার চাইতে সামান্য নিচে। ‘কাইবু’ বা খাঁজকাটা গাছের গুড়ি ব্যবহার করা হয় বাড়িতে প্রবেশের জন্য। ঘরের ভেতর থাকে ‘চি মা’ বা গৃহদেবতার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। তাছাড়াও রান্নার জায়গা বা ‘মে-রিং’, শোওয়ার ঘর বা ‘সিরি’, অতিথির জায়গা বা ‘দেইচি কো সিরি’, বাড়ির তলায় চলে পশুপ্রতিপালন। বারান্দা শুধুমাত্র আপ্যায়নের জন্য নয়, সাংসারিক সব কাজই চলে সেখানে। তবে আজকের টোটোপাড়ায় ‘না কে শা’ পাওয়া মুশকিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টোটোদের চিরাচরিত বাড়িও পাল্টে গেছে, লেগেছে আধুনিকতার স্পর্শ। এখন

অধিকাংশ টোটো পরিবার পাকা দালানবাড়িতে থাকতেই অভ্যস্ত। সাবেক সেই বাড়ির অভাব টোটোপাড়ার চেহারা সামান্য হলেও বদলে দিয়েছে। তবে কে না জানে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ঘরের ভেতর সাধারণত চই সুন, জিরং কোবে, সংকা মংকা পূজা হয়ে থাকে। সাতরিং, জিদিং, কুংরি, বারাইগোরি নুচে, পাদুওয়া (পাহাড় পুজো), তোর্ষা মেরে মধি, লাপু ভিন্তি, দাংতেনতি-হইনতি (নদী পুজো), বিরকো চইসুন, পকিংসওয়া (পাথরের পুজো) ইত্যাদি পুজো বাইরে হয়ে থাকে। টোটো সমাজের পুজোয় বলিপ্রথা রয়েছে আজও, তবে নব্যশিক্ষিত টোটো যুবকদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলে মনে হয়েছে যে, তারা এই প্রথার বিরোধী। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কার ও প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে একটু সময় লাগে বৈকি! অত্যন্ত ধর্মভীরু টোটো সমাজে সারাবছর পুজোপার্বণ লেগেই থাকে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, তাদের মন্দিরে কোনও বিগ্রহ থাকে না। আসলে তারা প্রকৃতির পূজারী। আকাশ, পাহাড়, নদী, গাছ, ভূমি ইত্যাদি তাদের উপাস্য। 'ঈশপা' হলেন টোটোদের প্রধান দেবতা। পুরুষ রূপে তিনি মহাকাল ও নারী রূপে মহাকালী বা সইনঝানি। টোটো সমাজে 'মইনাঙ্গ' বা 'পিদুয়া' নামের দেবতা বা অপদেবতাও রয়েছে। টোটোদের পুজোয় প্রধান পুরোহিত বা 'দেবপাও' বা 'কাইজি' এবং তার সহকারী 'দেওসী'-এর ভূমিকা বিরাট। টোটোদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের নাম হল 'ওমচু' ও 'ময়ূ' এবং এই দুটি পুজোই ঈশপার উদ্দেশে করা হয়ে থাকে। তবে তাদের পুজোয় মূর্তি দেখা যায় না, চিগাইমু এবং মুগাইমু নামের দুটি বড় বড় ঢোলকে তারা মহাকাল ও মহাকালীর প্রতীক হিসেবে পুজো করে থাকে। ওমচু পুজোর সময় কাল এখন পাঁচদিন থেকে তিনদিনে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। জুলাই মাসের শেষে বা অগাস্টের শুরুতে ওমচু পুজোর ২২ দিন পর ময়ূ পুজো হয়ে থাকে। ময়ূ পুজোর পরিধিও এখন ৯দিন থেকে ৫দিনে আনা হয়েছে। বাদ পড়েছে গরু বলির মত প্রথাও। ধর্মীয় উৎসব ও সমাজ পরিচালনার জন্য কাইজি (পুরোহিত), গাপ্পু (মোড়ল), পাও (ওঝা), নামপনের (সংগঠক) ভূমিকা মেনে নেওয়া হয়েছে।

আজকের টোটোপাড়ার টোটোদের খাদ্যাভাসেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চাল বা ভুট্টার ভাত, ডাল, সবজি এখন প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত। চলে লবণ চা বা 'না চাসিং'। আটা, মারুয়ার রুটির পাশাপাশি দাওনিং, কাইরিং, বুরিং, দুরিং, ডাকানি, লিসু, সতেই, লাকা, লাইরা ইত্যাদি পাহাড়ি ও জংলী আলু সংগ্রহ করা হয়। মাছ-মাংসও টোটো সমাজে বিশেভাবে আদৃত। 'চরুসাই' নামের শাকও তাদের খুব প্রিয়। আর রয়েছে টোটোদের নিজস্ব পানীয় ইউ। সাধারণত মারুয়া ও কাউন থেকে ইউ তৈরি করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে যে, ইউ হল টোটোদের সর্বক্ষণের পানীয়। সঙ্গে থাকে পান ও সুপুরি। রয়েছে ধূমপানের অভ্যেস। তবে আজকাল তামাক পাতা মুড়িয়ে নলের মধ্যে ঢুকিয়ে ধূমপানের চিত্র বিরল হয়ে এসেছে। বয়স্ক কিছু মানুষের মধ্যে এই অভ্যেস দেখা গেলেও, আধুনিক সময়ের টোটোদের পছন্দ বাজার চলতি প্যাকেটের সিগারেট। ঝুম চাষের রীতি পাল্টে যাওয়ার জন্য অতীতের খাদ্য আজ লুপ্ত হতে বসেছে। তবে এখনও শূকর-মাংস অত্যন্ত চালু। টোটোপাড়ার চারপাশের নদীতে মাছের সংখ্যা কমে আসায় বাজারের মাছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে টোটো সম্প্রদায়।

আজও টোটোপাড়ায় বিনোদনের জন্য বিদ্যালয়ে সদ্য নির্মিত অডিটোরিয়াম ছাড়া আর কোনও ধরনের প্রেক্ষাগৃহ দেখা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তথ্যের কোনও বিনোদন নেই। প্রতিটি আদিবাসী সমাজের মতই টোটো সমাজ নৃত্য গীতে পটু। টোটো ভাষা জানলে বা বুঝতে পারলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের গানে সমাজচিত্র থেকে শুরু করে অতীত ইতিহাস ফুটে ওঠে। গানে বলা হয় শিকারের কথা, ধর্মের কথা। আবার নারী-পুরুষের পারস্পরিক মন দেওয়া নেওয়ার কথাও তথ্যের গানে লিপিবদ্ধ। টোটোদের গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গান হল 'লেতিগেহুয়া' বা স্বপ্নদ্রষ্টাদের গান। কোনও সাধারণ টোটো এই গান গাইতে পারে না, এই গান গাইবার অধিকারী ইয়ং টং রাই, যিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতার আদেশ পান এবং গান বাঁধেন। ধর্মীয় সংগীত হলেও

এই গানে জীবনের কথাই ফুটে ওঠে। গানের পাশাপাশি টোটো নৃত্যও কিন্তু অসাধারণ। যদিও আজ ‘চ চি পাওয়া’ বা মহিলাদের নৃত্যের মত বেশ কিছু নাচ বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবু টুং টুং গামু, দৈতাপা, সেংজা, পেলা হো ইত্যাদি নাচগুলি দেখা যায়। সেংজা ছাড়া বাকি সব নাচেই শুধুমাত্র পুরুষদের দেখা যায়।

অতীতের সেই টোটোপাড়ার আমূল বদল না হলেও, পরিবর্তন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পর্যটনের সুযোগ রয়েছে বুঝে টোটোপাড়ায় এখন পিকনিক স্পটও দেখা যায় পাহাড়ের ওপরে। টোটোপাড়া যাওয়ার পথে সরকারি পর্যটক আবাস যেমন রয়েছে তেমনি কিছু হোম স্টে তৈরি হয়েছে। সরকারি পর্যটক আবাসটি থেকে লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া, টোটোপাড়ার পাশাপাশি মাদারিহাট, জলদাপাড়াও কাছেই হয়। টোটোপাড়ার মঙ্গলবারের হাটে জামাকাপড় থেকে শুরু করে বহু কিছুই মেলে, তবে দেখা যায় না কমলালেবুর বেচাকেনা কিংবা পিঠে কমলালেবুর টুকরি নিয়ে পাকদন্ডী বেয়ে নেমে আসা আদিবাসী সুঠাম পুরুষ বা ঝলমলে মহিলাকে। বল্লালগুড়ি পঞ্চায়েত অফিস থেকে টোটোপাড়া পর্যন্ত পথে এখনও পিচের আস্তরণ পড়ে নি, তবে টোটোপাড়ায় রাস্তাঘাট পাকা, ফলে যান চলাচলে কষ্ট হয় না। প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই দুই চাকার বাহন রয়েছে, ফলে মাদারিহাট থেকে কখন বাস বা ট্রেকার আসবে সেই ভরসায় থাকতে হয় না বেশির ভাগ মানুষকেই। তবে মাদারিহাট থেকে এখন বাসের পাশাপাশি কিছু জিপ ও মারুতি ভ্যান চলছে। টোটোপাড়ার খুদে পড়ুয়ারা বাঙালি-নেপালি-বিহারি-টোটো নির্বিশেষে ভীড় জমাচ্ছে টোটোপাড়ার ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাই স্কুলে কিংবা মাদারিহাট-টোটোপাড়া পথে উত্তর খয়েরবাড়ির কাছে তৈরি হওয়া বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে।

বারবার গিয়েও টোটোপাড়া পুরনো হয় না। প্রতিবারই নজরে পড়ে নতুন কোনও পরিবর্তন। হয়ত সেই পরিবর্তনের অনেককিছু ভাল লাগে না, কিন্তু এটা বুঝি যে, এই পরিবর্তন না মানবার কিছু নেই। টোটো সম্প্রদায়ের মানুষেরা যত বেশি নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হবেন, তত তাদের নিজেদের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাল। কেননা খুব কম জনপদের টোটোপাড়ার মত সম্পদ থাকে। সেদিক থেকে আমরা ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গবাসী অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। অন্যতম ক্ষুদ্র আদিবাসী সম্প্রদায় হওয়ায় আমাদের

টোটোপাড়া যাওয়ার রাস্তায় প্রথম ভাগটি এখন এমনই মসৃণ

তরুণ টোটো দম্পতি

লুইস ও অভিষেক টোটোর সঙ্গে লেখক

ওপরেও দায়িত্ব এসে পড়ে তাদেরকে দেখে রাখবার। বংশগত দারিদ্র, শিক্ষাহীনতা, অপুষ্টি দূর করে যেদিন টোটোপাড়া আমাদের সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে, সেদিন হয়ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে। তাই যখন আমার প্রিয় দুই ছাত্র বিপ্লব ও অভিষেক তাদের নিজেদের ভাষায় গেয়ে ওঠে "নুবাই কাঙ জোড়া দিবাই কাংয়াং গোত্রদাঙতা কাঙ, হিপসা খাংতা কাঙ চুংচা/ অকো পাই কতা ইয়ং কো জেজেঙ কইয়া লোই/ লেই বার বার লেই / তে বার বার তে সানি / তাত্রপুন তেনা / সেনে বোকো তে লাকা ডাইকো তে / ইয়চ পুঙ, ওয়াঙ পুনা মুমুঙরো সেঙ্গে / লেই বার বার লেই / লুনডি ইয়ং বিহিং মোই দিঙনা / মোইবে তিঙ্কো লেই সামা তিঙ্কো লেই/ লেই বার বার লেই" (পূর্বে তোর্ষা, পশ্চিমে পাহাড়, উত্তরে দেবতা হিপসা, দক্ষিণে ঘন অরণ্য, তার মাঝে সুন্দরী টোটোপাড়া, এস বন্ধু এস। চলো বন্ধু সূর্য উঠেছে, জঙ্গলে যাই কাঠ আনতে, বৃষ্টি হলে গাছ ভিজবে, মাঠ আমাদের ডাকে, ধান লাগাই চলো, মারুয়া লাগাই চলো, চলো বন্ধু চলো), তখন মনে হয় চলি আবার পাহাড়-নদী-অরণ্য ঘেরা রহস্যময় টোটোপাড়ায়...

ভগীরথপুর জমিদারির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস

জাহির রায়হান

কর্ডেলিয়া মিশ্র এখন সপরিবারে থাকেন কলকাতায়। নগর জীবনে অভ্যস্ত চৌধুরী বংশের বর্তমান প্রজন্ম। তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে পড়ে রয়েছে মৃতপ্রায় ভৈরব নদীর তীরে। যে ভগীরথ শাহের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এই অঞ্চলটি পরিচিতি পেয়েছিল ভগীরথপুর নামে, তিনিই নাকি ছিলেন চৌধুরী জমিদার বংশের আদি পুরুষ। তবে এখন সেই রামও নেই, নেই রাম রাজত্বও। কর্ডেলিয়া মিশ্র জানেন একথা। তিনিই জানালেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে পারিবারিক দুর্গা পুজো। চৌকো দুর্গা দালান ক্ষয়ে যাওয়া অতীত কথার ক্ষত বহন করে চলেছে অনুচ্চস্বরে। সংসার সামলে নানান বাধ্যবাধকতাকে পাশ কাটিয়ে কর্ডেলিয়া মগ্ন এখন হারানো দিনের কিছুটা অন্তত ফেরানোর কাজে। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা আগামী শারদোৎসবে আবার শুরু করা ভগীরথপুর চৌধুরী জমিদার বংশের মাতৃ আরাধনা। যন্ত্রপাতি, লোকলস্কর নিয়ে রাজমিস্ত্রিরা তাই দিনভর ব্যস্ত দুর্গা দালানের চারকোণা চাতাল জুড়ে।

ভৈরব নদীর পশ্চিমপাড়ে হরিহরপাড়া ব্লকের সুন্দলপুর ঘাট। পূর্বপাড় ফতেপুর, ব্লক ডোমকল। নদীর দুই পাড়কে যুক্ত করেছে বাঁশ নির্মিত চওড়া সেতু। মানুষ ছাড়াও গাড়ি ঘোড়াও দিব্যি পার হতে পারে সেই সেতু বেয়ে। পায়ে হেঁটে পার হওয়া ঘাটের পারানি তিন টাকা। ফতেপুর পৌঁছে পথ চলতি এক কৃষককে জিজ্ঞেস করতেই অদ্ভুত বর্ণনা পাওয়া গেল ভগীরথপুর বাবু পাড়ার। বাজার ছাড়িয়ে যখনই দেখা যাবে বাংলা ইঁটের বাড়িঘর মায় মহল্লা, জানবেন সেটাই বাবু পাড়া। এই পাড়াতেই বাস করতেন তৎকালীন বাবুরা স্বজন পরিজনসহ। এখানেই অবস্থান ছিল অতীতের চৌধুরী জমিদার বংশের। সমগ্র পাড়াটিই এক লহমায় পিছিয়ে নিয়ে যায় সেই বৈভবে, যেখানে আধুনিকতার মিশেল খুব একটা জরুরি বিষয় নয়।

কালো পিচ রাস্তা বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডোমকল শহরের পানে। আর ঠিক বাঁক থেকেই ইঁট মাটির ধুলোময় রাস্তার উৎপত্তি, সটান ঢুকে গেছে বাবু পাড়ার অন্দরে। রাস্তার দু'ধারে থমকে রয়েছে সময়। আর সময়ের অলিগলিতে চোরাগোপ্তা চাহনি নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌধুরী জমিদারির ইতিবৃত্ত। বাংলা ইঁটের প্রতিটি ফোঁকরে চুন-সুড়কির সুড়সুড়ি, কোথাও কঙ্কালসার কড়ি-বরগার নিদারুণ আর্তি, কোথাও বা ধ্বসে পড়া ভঙ্গুর দেওয়াল যার ফাঁক থেকে উঁকি মারছে অযত্নের বট গাছ সবজে রঙে মাখামাখি হয়ে। গলির শেষ প্রান্তে সাদা চুনকাম করা পরী বাড়ি। বাড়ির মাথায় দু জোড়া জল বালিকার খুনসুটি। গোটা পাড়াটিই অদ্ভুত রকমের নিঝুম। বড় বড় শক্তপোক্ত কাঠের দরজার আড়ালে-আবডালে কোন ইতিকথা গুমরে মরছে অজান্তে, তা জানতে আনচান করে ওঠে প্রাণ।

সন ১৫৯৪, দিল্লির সিংহাসনে আসীন সম্রাট আকবর। সুবে বাংলা ও বিহারে মোগল শাসনকে সুদৃঢ়

করার অভিপ্রায়ে রাজা মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন তিনি। রাজা মানসিংহ বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করলেন রাজমহলে। রাজমহলের নতুন পরিচয় হল আকবর নগর। সুবেদারি গ্রহনের পর রাজা মানসিংহ বাংলার বারো ভুঁইয়া এবং বিহারের পাঠান শাসকদের বাড়বাড়ন্তে লাগাম পরাতে উদ্যত হন তিনি। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুতে বিরতি পড়ে সে রাজ উদ্যোগে। অচিরেই আকবরের স্থলাভিষিক্ত হলেন শাহাজাদা সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর। তিনি ইসলাম খাঁকে সুবেদার করে বাংলায় পাঠালেন ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে। মানসিংহের আরদ্ধ কাজে গতি এল পুনরায়। তৎকালে বাংলার অসংখ্য ছোট বড় জমিদার ও পাঠান শাসকবর্গ ছিল প্রায় স্বাধীন। প্রতাপাদিত্য ছিলেন বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম। যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গমে ধূমঘাট নামক স্থান ছিল প্রতাপাদিত্যর রাজধানী। ইসলাম খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন বিরাট সেনাবহর। একইসঙ্গে বাকলার রাজা এবং প্রতাপাদিত্যর জামাতা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও চালানো হল অভিযান। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় রসদ ও অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য আলাদা সরবরাহকারী দল থাকত সব অভিযানেই। সেটাই ছিল তৎসময়ের যুদ্ধাভিযানের রেওয়াজ রীতি।

প্রতাপাদিত্যর বিরুদ্ধে সমরাভিযানেও এই প্রণালী অনুসৃত হয়। সেনাপতি মির্জানাথনের বাহিনীকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বজরাযোগে উক্ত বাহিনীর অনুসারী হয় ভগীরথ শাহর নেতৃত্বে পাটনাস্থিত শাহ ব্যবসায়ীদের একটি দল। মোগল সেনাপতি মির্জানাথনের নৌবাহিনীকে অনুসরণ করে ভগীরথ শাহ ভৈরব নদীর কয়েকটি বাঁক অতিক্রম করে পৌঁছয় শস্য শ্যামলা অতি মনোরম একটি জনপদে। জনপদটি মনোহরণ করে সরবরাহকারী দলের। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানেই পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপনের। সেই হঠাৎ গড়ে ওঠা অঞ্চলটিই আজকের ভগীরথপুর, বর্তমানে ডোমকল মহকুমার অন্যতম বর্ধিষ্ণু এলাকা।

ভগীরথপুরে জমিদারি পত্তনকারী প্রথম পরিবারটির বিষয়ে বিশদে জানা যায় না। তবে

ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে একচেটিয়া লবণের কারবার করে তাঁরা যে প্রভূত অর্থের মালিক হন তা একপ্রকার সত্য। নবাব আলিবর্দি খাঁ'র সময়কালে তাঁরা লাভ করেন চন্দননগর নিকটস্থ নদমঙ্গায় লবণ কেনার সনদ। নিজামতে বৃদ্ধি পায় তাঁদের প্রতিপত্তি। সম্ভবত সেই প্রতিপত্তি ও সমাদরের কারণেই তাঁরা 'চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন নবাব কর্তৃক। বলদেব চৌধুরী'র সময় হতে ক্রমশ আর্থিক সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছয় পরিবারটি। খাগজানা, কুমিরদহ, লালবাগ সীমান্ত, গৌরিপুর, শিবনগর প্রভৃতি জমিদারি ক্রয় করেন তাঁরা। নীলকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, চারুকৃষ্ণ চৌধুরী, সুব্রহ্মণ্যকৃষ্ণ চৌধুরী (বঙ্কুবাবু), শ্যামলাল চৌধুরী, গায়ত্রী চৌধুরী প্রমুখ এই বংশের খ্যাতনামা জমিদারবর্গ।

তবে সেসব অতীত কথন আজ যেন দিকভ্রষ্ট পথিক। সব হারানো সব খোয়ানো এক পথচারী যে জানে না এই ক্ষয়িষ্ণু পথযাত্রার শেষ কোথায়। শতকের পর শতক ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য শতকের পর শতক ধরেই ধীরে ধীরে অগোচরে অজ্ঞাতে হারিয়ে যাচ্ছে ধীর লয়ে। একদিন হয়ত ধূলোবালি হয়ে সম্পূর্ণরূপে মিশে যাবে ঐ পথের ধুলিকণার সাথেই। আরও একটা ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে কালের করাল গ্রাসে। সে সময়ের বুঝি আর বেশি দেরি নেই, এখন একমাত্র কর্ডেলিয়া মিশ্রদের সদিচ্ছার ওপরেই ভরসা। সমস্ত কিছু 'নাই' হয়ে যাওয়ার ভবিতব্য হতে তাঁরাই হয়ত বাঁচিয়ে রাখতে পারেন চৌধুরী জমিদারির ইতিহাস ভাবীকালের উদ্দেশে, অন্তত আরও কিছু সময়ের জন্য, আরও কিছু দিনের জন্য।

কেমন আছ পাহাড় ?

দার্জিলিং

শ্বেতা সরখেল

পাহাড়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম লকডাউন উঠে যাবার পর। এমন জীবনযাপন অভ্যেস করতে হবে স্বপ্নেও ভাবি নি কোনওদিন। ঘরে বসে বসে, নিজের সমস্ত কাজ নিজে করে, সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে হাতের চেটো প্রায় সাদা করে ফেলে সে এক আতঙ্কিত দিনাতিপাত।

আমরা মনুষ্যকুল সম্যক জানি প্রকৃতি আমাদের কী দেয় আর আমরা তাকে কী দিই। জেনে বুঝে অন্যায় করি, করেই যাই। জ্ঞানপাপী বলেই এটাও বুঝতে পারলাম যে এই অতিমারী আসলে প্রকৃতিরই প্রতিবাদ। মানুষকে ঘরবন্দী না করে ফেলা পর্যন্ত এই প্রকৃতি নিধনের যজ্ঞ থেকে রেহাই নেই কারুর। প্রকৃতি তাই মুখোমুখি অসম যুদ্ধে না গিয়ে বদলা নেওয়ার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করল যাতে সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না। বুঝতে কিছুই বাকি নেই আমাদের।

লকডাউন উঠে যাবার পর আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না তাই। প্রকৃতির সঙ্গে একটা আত্মিক নিবিড় সম্পর্ক যে মানুষের আছে সেটাও তো ঠিক। প্রকৃতিকে

মানুষের থেকে আলাদা করে ভাববার তো কোনও কারণ নেই! উভয়কে নিয়েই তো এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাই একে অপরের সঙ্গে দেখা না করে আর কতদিন!

পাহাড় কেমন আছে তার খোঁজ নিতে বেরিয়ে পড়েছিলাম দু'রাত্তিরের জন্যে। একরাত কাটালাম সিলেরিগাঁও-তে। তারপর ঘুরে এলাম দার্জিলিং, ফেরার পথে লামাহাটা হয়ে পেশক রোড ধরে জলপাইগুড়ি।

১

লাভা থেকে আলগাড়া হয়ে পেডং-এর দিকে যেতে গিয়ে বাঁ হাতে ওপরে উঠে গেলে সিলেরিগাঁও। গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন বেলা দেড়টা। ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিপাশ। ভাবখানা এমন যেন একটু বাদেই রাত নেমে আসবে। শিমিস্কা হোমস্টেতে বুকিং ছিল আমাদের। রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছি তো নেমেই চলেছি। সিঁড়ির ধাপগুলো আমার মত ছোট্টখাট্ট মানুষের জন্য অনেকটাই খাড়া। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে বেঁচে যাচ্ছিলাম, আর আমার পার্টনার তাই নিয়ে মুচকি হাসি দিতে দিতে আমাকে সামলে নিয়ে এগোচ্ছিল। কিন্তু যে ছেলেটি আমাদের লাগেজপত্রগুলোকে মাথায়, কাঁধে, হাতে নিয়ে চলছিল আমাদের আগে আগে সে তো মাথা সোজা রেখে অনায়াস ভঙ্গিমায় ছন্দে ছন্দে সিঁড়ি ভাঙছিল এমনভাবে যেন রোবট একখানা। মুখে হাসি নেই, চোখের দৃষ্টিতে নেই কোনও উত্তেজনা।

যেখানে আমাদের ঘর সেখানে পৌঁছে দেখলাম সামনে কংক্রিটের একটা চাতাল বানানো। ওখানে আগুন জ্বালানো হয় রাতে। আর চারপাশটা এমন খোলা যে চোখ কোনও বাধা না পেয়ে চলে যাচ্ছে দূর দূরান্তের পাহাড়ের সারির ওপর। একের পর এক পাহাড়ের সুডৌল শরীর যেন একে অপরের ওপর আহ্লাদিত হয়ে ঢলাঢলিতেই ব্যস্ত। ঝুম চাষের মত সারিতে সারিতে নেমে গেছে আরও অনেকগুলো ঘর-বাড়ি। সেগুলো সবই হোমস্টে।

ঘরে ঢুকলাম বটে, তবে প্রথম

লামাহাটা

দেখায় ঘরটা তেমন পছন্দসই মনে হল না। এই ঠান্ডায় সবচাইতে জরুরি যেটা সেটা হল গরম জল। কিন্তু বাথরুমে গিজার নেই। কিন্তু ভুল ভেঙেছিল পরে, গরম জলের রুম সার্ভিস দেখে। চমকে গিয়েছিলাম আমি। কথা নেই বার্তা নেই গরম জল দিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ না কেউ। গিজারের ভূত মাথা থেকে নামতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ঘরটা ঠিকঠাক, কোনও বিলাস নেই। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। ঘরে গিয়ে বসামাত্র গরম গরম চা চলে এল বলার আগেই। সেই সঙ্গে এক জগ ভর্তি গরম জল। জিজ্ঞাসা করল ছেলেটি, নাহানা হ্যায়?

আমরা আঁতকে উঠে বললাম, নেহি নেহি।

ঘরে ঢুকলাম বটে, তবে প্রথম দেখায় ঘরটা তেমন পছন্দসই মনে হল না। এই ঠান্ডায় সবচাইতে জরুরি যেটা সেটা হল গরম জল। কিন্তু বাথরুমে গিজার নেই। কিন্তু ভুল ভেঙেছিল পরে, গরম জলের রুম সার্ভিস দেখে। চমকে গিয়েছিলাম আমি। কথা নেই বার্তা নেই গরম জল দিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ না কেউ। গিজারের ভূত মাথা থেকে নামতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

আগর বাথরুমমে গরম পানি চাহিয়ে তো বোল দেনা।

আমি অপটু হিন্দিতে বললাম, জরুর।

আমি হিন্দিতে নিজের পারদর্শিতা জাহির করতে গিয়ে খানিকবাদেই হুড়কো খেয়ে পড়ে গিয়ে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফিরে আসি বাংলায়। কিন্তু দেখি ওরা কেমন সুন্দর বাংলা বুঝে যায়। আমি বুক ফুলিয়ে মাতৃভাষা বলে চলি কিন্তু পাশাপাশি ওদের নিজেদের মাতৃভাষা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমার ভাষাটিকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে লজ্জাও পাই।

বাড়ির মালিকের নাম স্মরণ। স্মরণজী-র বাংলা শুনে আমি তো তাজ্জব। আমি তো বলেই ফেললাম, আপনি এত ভাল বাংলা বলেন?

আপনারা আসেন তাই শিখে লিয়েছি।

বলেই গজদাঁতটা বের করে মিষ্টি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। গাড়িটা রাস্তার পাশে পড়ে থাকবে সারারাত? জিজ্ঞাসা করল গাড়ির মালিক। মানে আমার পার্টনার।

নেহি নেহি। চাবিটা দিন। আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখছি। আঙুল দিয়ে নিচের দিকে দেখালেন। বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে ওঁর থাকার ঘর। সেখানে পরিবার নিয়ে থাকেন উনি। চাবি নিয়ে গিয়ে গাড়িটাকে আদরযত্নে নিজের বাড়ির সামনে রেখে দিলেন রাতটুকুর জন্যে। পরদিন সকালেই আমরা ফিরে যাব।

সন্ধে নেমে এল। আগুন জ্বালানো হল সামনের চাতালে। কনকনে ঠান্ডায় চেয়ার নিয়ে বসলাম পাশে। আমাদের পরের দুটো ঘরে একদল অল্প বয়সী ছেলে। মোবাইলের সঙ্গে সাউন্ড সিস্টেম কানেক্ট করে বাজানোর প্রায় মিনিট কয়েকের মধ্যে এক এক করে ঘর থেকে বেরিয়ে তারাও এসে বসে পড়ল আমাদের সঙ্গে। ক্যাসারোল ভর্তি মাংস, স্ন্যাক্স হিসেবে। টপাটপ তুলে তুলে খাওয়া চলছে। জমে গেল আড্ডা। কখন যে রাত্তির ন'টা বেজে গেল টেরই পেলাম না। ওই রকম নিশ্চুপ নিঃঝুম পাহাড়ে আমাদের মত আরও কয়েকটি পরিবার অন্যান্য হোমস্টেগুলোতে তাদের মত করে আনন্দ করছিল আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। এখানে নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ হল না ঠিকই কিন্তু এমন আনন্দও অনেকদিন পর করা হল এটাও সত্যি।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম বাঁ দিকে ঝকঝকে আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া হীরকজ্যোতি ছেটাচ্ছে আমাদের দিকে। কাছাকাছি একটি ভিউপয়েন্টে আছে সেখানে গেলে আরও অনেক ভালভাবে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার বেশ কয়েকটা চূড়া।

একটা মজার কথা বলি। সিলেরিগাঁওতে থাকতে গিয়ে সেই দুপুরের অমন অদ্ভুত রান্না আজ অবধি কোনও রিসর্ট কিংবা হোমস্টেতে পাইনি। আসলে

আমাদের রেসিপি আমাদের পছন্দ হবেই। কিন্তু অন্যরকম হলেই সমস্যা। ওদের রান্না ওদের মত। সব খাবারের স্বাদ যেন একইরকম। কিন্তু এটা বলতেই হবে যে, সমস্ত একেবারে গরম গরম, ধোঁয়া ওঠা। দুপুরে খাওয়ার পর স্মরণজীকে বললাম বাধ্য হয়ে,

স্মরণজী, চিকেন থোড়া ঠিক সে পাকানে কো বোলিয়ে। আচ্ছা নেহি লাগা।

স্মরণজী অবলীলায় বললেন,ঠিক হ্যায়, বোল দুঙ্গা। লেকিন ও লোগ তো অ্যায়সে হি পাকাতে হ্যায়।

বুঝলাম সত্যিই তো, ওরা যেভাবে খেয়ে অভ্যস্ত ওরা তো সেভাবেই বানাবে! এতে খারাপ লাগবার তো কিছু নেই! বরং এই স্বাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গ্রাম্য ঘ্রাণটা উপলব্ধি করতে না পারার ত্রুটির জন্য লজ্জিত মনে হল নিজেকে।

পরদিন সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ পোহালাম। গাছের ফাঁকে ছোট্ট ছোট্ট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। কমলা রঙের গা। সিবিয়া। পাহাড়ি বুলবুলও ছিল।

ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়ি নিয়ে সবে রওনা হয়েছি, কিলোমিটার খানেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল 'সিঙ্কোনা কমন ফরেস্ট'। লোকাল নাম এমনটাই। এ ফরেস্টের অন্য কোন নামও থাকতে পারে, তবে স্থানীয় মানুষজনের কাছে এ নামটিই প্রচলিত। গাড়ি থামিয়ে আমরা নেমে পড়লাম পাখি দেখার লোভে। কত যে রকমারি পাখি কী বলব! ঝাঁকে ঝাঁকে হিমালয়ান ময়না, কালো গায়ে কমলা ঠোঁট। এক এক ঝাঁকে অন্তত শ'তিন চারেক ময়না হবে। একবার এদিক থেকে ওদিকে উড়ছে, আর একবার ওদিক থেকে এদিকে। সিবিয়া যে কত! দেখতে দেখতে চোখ চলে গেল এ গাছ থেকে ও গাছে, ও গাছ থেকে সে গাছে। দেখলাম, মাউন্টেন বুলবুল, স্কার্লেট মিনিবেট, ব্লু রকথ্রাস, একরকমের ফ্লাইক্যাচার, গ্রীন ব্যাক্‌ড্ টীট। আরও একরকমের পাখি দেখলাম এক্কেবারে খুদে আর অসম্ভব রকমের চঞ্চল। কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে না। তারাও একসঙ্গে অনেক। হলদে রঙের গা। ওদের অমন ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়া দেখতে দেখতে আমরা হেসেই কুটিপাটি।

হঠাৎ দেখি মাথার ওপর গ্লাইড করতে করতে নামছে ছোটখাট চেহারার একটা ঈগল। স্পষ্ট বোঝা গেল বাচ্চা রুফাস বেলি ঈগল। পরে আরও সুন্দর করে ওর ওড়া দেখতে লাগলাম অনেক্ষণ ধরে, যেন গোটা আকাশটা ওরই। চোখ জুড়িয়ে গেল। একটা বাজ অথবা ঈগল, বেশ বড় সাইজের, ভয়ংকর গতিতে আমাদের পাশ দিয়ে বাতাস কাটার আওয়াজ উঠিয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। দেখে মনে হল নিশ্চই শিকার পেয়েছে কোনও। অত দ্রুত গতির জন্য ওর বিশালত্ব আর গায়ের রঙ ছাড়া তেমন করে বুঝতে পারি নি ঠিক যে ও আসলে বাজ ছিল নাকি ঈগল।

ঘণ্টা দুয়েক ওখানে কাটিয়ে আমরা নেমে এলাম

এ যাত্রায় এক রাত্তির রইলাম। ম্যালে একটু ঘোরাঘুরি ছাড়া বেড়ানোর কোনও ইচ্ছে বা প্ল্যান ছিল না এবার। পরদিন ফেরার সময় লামাহাটায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম আর লাঞ্চ। ওখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খুব সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের এক খন্ডাংশকে ঘিরে সেখানে ফুলের গাছ লাগিয়ে একটা বেশ বড়সড় বাগান বানানো হয়েছে। তাতে বেঞ্চ পাতা রয়েছে আমাদের মত পর্যটকদের জন্য যাদের পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটলে পা ব্যথা হয়ে যায়।

লাভায়। সিলেরিগাঁও-তে তাঁদের যেতেই হবে যাঁরা পাখি দেখতে কিংবা পাখির ছবি তুলতে পছন্দ করেন। একটা ভাল বাইনোকুলার আর একটা শক্তিশালী ক্যামেরা কাঁধে নিলে এই ফরেস্টে ঘুরে ঘুরেই কেটে যাবে কয়েকটা দিন।

২

অনেকবার দার্জিলিং গিয়েও যে অভিজ্ঞতা হয়নি এবারে সেটাই হল। শীতের শুরুটা ট্যুরিস্টদের জন্য একেবারে হাই টাইম। খুব ভিড় হয় ম্যালে। অনেক

হিল ময়না

ব্লুফ্রন্টেড রেডস্টার্ট

দোকানী ফুটপাতে উলের পশরা সাজিয়ে বসেন। কিন্তু এবারে তেমনটা চোখে পড়ল না। মুষড়ে পড়া এক দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এবারে তাঁরা উলের পোশাক খুবই কম বানিয়েছেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এবারে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা এক্কেবারেই কম। হয়েছেও তাই। যে পর্যটকের ওপর ভিত্তি করে পাহাড় বেঁচে থাকে সেখানেই ঘাটতি। তবুও আমাদের মত বেশ কিছু মানুষজন আছেন যাঁরা এতদসত্ত্বেও পিছিয়ে নেই বেড়ানো থেকে।

যেখানে ছিলাম সেই হোটেলে ঢুকতে ঢুকতেই আমাদের লাগেজগুলো সরিয়ে নেওয়া হল অন্যত্র। স্টীম স্যানিটাইজার দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হল সেগুলো। আমাদের হাতেও স্যানিটাইজার দিয়ে দিল রিসেপশনে থাকা ছেলেটি। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। যত দিন যাচ্ছে এসব এখন সয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনদিনও কি চিন্তা করেছিলাম এমনটা আবার ঘটতে পারে? যে রেস্টুরেন্টে ভাত খেলাম সেখানেও প্রতিটা টেবিলের মাঝখানে স্যানিটাইজার।

এ যাত্রায় এক রাত্তির রইলাম। ম্যালে একটু ঘোরাঘুরি ছাড়া বেড়ানোর কোনও ইচ্ছে বা প্ল্যান ছিল না এবার। পরদিন ফেরার সময় লামাহাটায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম আর লাঞ্চ। ওখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খুব সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের এক খন্ডাংশকে ঘিরে সেখানে ফুলের গাছ লাগিয়ে একটা বেশ বড়সড় বাগান বানানো হয়েছে। তাতে বেঞ্চ পাতা রয়েছে আমাদের মত পর্যটকদের জন্য যাদের পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটলে পা ব্যথা হয়ে যায়। ছোট্ট একটা কৃত্রিম পুকুর বানানো আছে ওখানে, সেটিও চমৎকার। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে পেশক রোড ধরলাম আমরা।

পাহাড়ের মানুষজন সকলে যে অনেকটাই সাহসী হয়ে উঠেছেন এবং করোনাকে উপেক্ষা করেই নেমে পড়েছেন রাস্তায় তা বোঝা গেল মাস্ক পরা দেখে। প্রায় কারুর মুখেই মাস্কের চিহ্নমাত্র নেই। উপায়ই বা কী তাঁদের? তাই করোনার দিকে বুড়ো আঙুল। তাঁরা ভাল নেই। অনেক টাকার লোকসান হয়ে গেছে তাঁদের। এই ক্ষতি সহজে উসুল হবার নয়। লক্ষ লক্ষ-ই নয় কোটি কোটি টাকার লোকসান পূরণ হবে কীভাবে? আজও তো ট্যুরিস্ট নির্ভর এই শহর হা পিত্যেশে বসে আছে পর্যটকের অপেক্ষায়। বড্ড চিন্তায় তাঁরা। বেড়ালাম বটে, কিন্তু তাঁদের কপালের ভাঁজের কোনও সুরাহা করতে না পারার অক্ষমতা আমার নিজের কপালেও ভাঁজ তুলে দিল স্বাভাবিকভাবেই।

আনলক ড্রাইভ ২

একটি পাহাড়ি ডে আউট

চন্দ্রাশ্রী মিত্র

আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে মানুষ কিছুটা হলেও ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আর বাইরে বেরিয়েও পড়েছে। খুব দূরে কোথাও না গেলেও আমাদের আশপাশের অনেক জায়গাই আছে যেখানে একটি সারাদিনের জন্য বেড়ানোর প্ল্যান বা অন্তত একরাত্রি থাকার জন্য ভীষণ সুন্দর।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে এরকম জায়গা থেকে ঘুরে আসাই যায়। সকালে একটু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নতুন চাল আর আলু দিয়ে সেদ্ধ ভাত ডিমসেদ্ধ সহযোগে পেটে চালান করে নটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে এরকম হারা নোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেই হল।

বাইরে কোথাও যদি খেতে না চান সেক্ষেত্রে শুকনো খাবার সঙ্গে থাকল। গাড়ির মধ্যে তুলে নিন স্যানডুইচ চিপস কেক ফল অথবা লুচি আলুর দম। আর ফ্লাস্কে গরম চা বা কফি।আর অবশ্যই কমলালেবু। পাহাড়ি পথে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশ্যই পাওয়া যাবে বসে পড়ার মত উপযুক্ত জায়গা। ম্যাট বিছিয়ে বসে পড়ুন।

সবাই মিলে বসে গুছিয়ে খাওয়াদাওয়ার করে আসার সময় সেই জায়গাটা পরিস্কার করে দিয়ে আসবেন অবশ্যই। একটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ নেবেন তাতে সমস্ত ফেলে দেওয়া খোসা প্যাকেট সব কিছু তুলে নিয়ে আসবেন। শিক্ষিত সচেতন মানুষের মত আচরণ করতে অসুবিধে কোথায়!

যদি ফেরার ইচ্ছে না থাকে একদিনের জন্য থাকার ঠিকানা আশপাশে জঙ্গলে আর পাহাড়ে অজস্র আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

যেতে পারেন কার্শিয়াং। প্রথমে কার্শিয়াং পেরিয়ে মার্গারেট ডেকে যাবেন। গুডরিকের একটি অসম্ভব সুন্দর টি বুটিক। নিতে পারেন ক্যাসলটনের এক পট প্রিমিয়াম মাসকাটেল আর পিনাট কুকি। হ্যাঁ দাম অবশ্যই বেশি। রোজ তো নয়, একদিন এই স্বাদের

জন্য দক্ষিণাটি খুব বেশি গায়ে লাগার কথা নয়।

কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে এগিয়ে যান আরও দেড় দুই কিলোমিটার। ডানদিকে একটা রাস্তা সোজা উঠে গিয়েচিমনি হয়ে বগোরা ঘুরে আসুন। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে মনে হবে সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে গেছি। মাঝে মাঝে গাড়ি থামাতে হবে। নামতে হবে পথে। এত অপূর্ব দৃশ্য মোবাইল বন্দী করতে হবে যে। কপাল ভাল থাকলে দেখা যাবে পরিস্কার আকাশের গায়ে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর মেঘলা থাকলে কুয়াশা ঘেরা পাইন বন সে যেন আরও অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে। প্রতিটা বাঁক এতো সুন্দর মনে হবে এখানে কিছুক্ষণ অন্তত থেকে যাই। বগোরা আর চিমনির আশপাশে এখন অনেক হোম স্টে তৈরি হয়েছে। গুগল সার্চ করলেই পাওয়া যাবে তাদের সন্ধান। চাইলে এখানেই কোনও হোম স্টেতে থেকে যাওয়া যায়। আর সেদিনই বাড়ি ফেরার প্ল্যান যদি থাকে তাহলে ডাওহিলের পথে আবার ফিরে আসুন কার্শিয়াং। সরকারি ট্যুরিস্ট লজে চিকেন কাটলেট আর মোমো সাথে গরম কফি খেতে খেতে পড়ে আসবে শীতের ছোটদিনের বেলা। ফিরে আসতে পারেন বাড়ির উদ্দেশে। কতক্ষন ই বা লাগবে। বেশি হলে তিন/চার ঘণ্টা।

আর যদি একরাত্রি থাকতে চান হদিস দিই একটি কাছাকাছি হোম স্টের।

সানি সাইড ইকো স্টে, গথেলস স্কুলের কাছে। কার্শিয়াং। ডাবল বেড কটেজের ভাড়া ২০০০ টাকা। ব্রেকফাস্ট সহ।

চিকেন মিল ডিনারের দাম ২৫০ টাকা। ফায়ারপ্লেস জ্বালালে ২৫০ টাকা একস্ট্রা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন আর সুন্দর। গানে আড্ডায় কেটে যাবে একটা রাত। স্মৃতি ঘোরাফেরা করবে অনেক দিন মনের মধ্যে। আর একটা কথা, কোথাও প্লাসটিকের প্যাকেট বা অন্যান্য আবর্জনা ফেলে রেখে আসব না। পাহাড়ের বা জঙ্গলের পরিবেশ দূষণ রোধে এইটুক অন্তত আমরা প্রত্যেকেই তো করতে পারি। ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে পারি একটা দূষণ মুক্ত দুনিয়া।

সানি সাইড ইকো স্টে। কার্শিয়াং
যোগাযোগ - ৭৩১৮৭৬১৪৩৮

আসামের চিঠি

গুয়াহাটি বইমেলায় ঝড় তুলল বাস ড্রাইভারের উপন্যাস

সমর দেব

‘লাইফ অব আ ড্রাইভার, কেবিনর ইপারে’। মাত্র দু’সপ্তাহে বইটির আটটি মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। প্রকাশক, অসমিয়া সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কর্তা অনিল বরুয়া নিজেই জানিয়েছেন, প্রতিবার মুদ্রিত হয়েছিল এক হাজার কপি। সদ্যসমাপ্ত গুয়াহাটি বইমেলা চলাকালেই ক্রেতা তথা পাঠকের চাহিদা মেটাতে নতুন করে ছাপতে হয়েছে একাধিকবার। এদেশে প্রকাশনার জগতে এঘটনা সত্যিই বিরল। বিশেষ করে বইটির ভাষা অসমিয়া। দামও খুব কম নয়, তিনশো টাকা। ফলে, যতদিন অনুবাদ না হচ্ছে ততদিন দেশের অন্যত্র এই বইয়ের বিক্রির প্রশ্নই নেই। সেকারণে অসমের চৌহদ্দিতেই বইটি বিক্রি হয়েছে। এরকম সীমিত ক্ষেত্রে বইটির এই বিপুল বিক্রিতে অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছে। অসমিয়া ভাষীদের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আগ্রাসী পড়ুয়া হয়ে উঠেছেন সেটা ফের প্রমাণিত এঘটনায়। ক’দিন আগেও যাঁর নাম কেউ শোনে নি, তিনিই মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বিখ্যাত লেখক হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎই তুমুল জনপ্রিয়তা হয়ে ওঠা সদ্য-লেখক রূপম দত্ত ছিলেন নাইট সুপার বাসের ড্রাইভার। দীর্ঘ পনেরো বছর নাইট সুপার বাসের ড্রাইভারের কাজ করেছেন রূপম। এখন তাঁকে নিয়মিত বাস চালাতে হয় না। তবে, মাঝেমধ্যে আগের মতই নাইট সুপারের স্টিয়ারিঙে হাত রাখেন তিনি। নিজের ড্রাইভার

পরিচয়ে তিনি গর্বিত। কথায় কথায় তিনি জানান, ড্রাইভারের জগত একেবারে আলাদা, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তার প্রচুর পার্থক্য। উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার বরদলৈ নগরে তাঁর বাড়ি। বাবা ছিলেন একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। রূপম উচ্চশিক্ষার জন্য গুয়াহাটিতে এসে গুয়াহাটি কমার্স কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর চাঁদমারিতে অসম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। কিন্তু মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেন এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। প্রথমে জীবিকা হিসেবে সবজির গাড়ি, ট্রাক ইত্যাদি চালিয়েছেন। পরে চালাতে শুরু করেন নাইট সুপার বাস। একই সঙ্গে তিনসুকিয়ায় মাংসের ব্যবসাও শুরু করেন।

এভাবেই একদিন হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন রূপম। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখতে শুরু করেন উপন্যাস। ২০১৯ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় অসম কৃষি বিশ্বিবদ্যালয়ের এক ছাত্রীর প্রাণহানি ঘটেছিল। ঘটনাটি তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সোশাল মিডিয়ায়। হাজার হাজার মানুষ ওই ছাত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিল গাড়িচালককেই। রূপম নিজে গাড়ি চালক বলেই জনগণের অভিযোগ মেনে নিতে পারেননি। তিনি স্বীকার করেন, অনেক সময় চালকের দোষে গাড়ি দুর্ঘনাগ্রস্ত হয় ঠিকই, কিন্তু সবসময় সেরকম হয় না। মানুষের অভিযোগে তিনি মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি চালকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। একজন চালক হিসেবে মনের কথাগুলো নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ওয়ালে লিখতে শুরু করেন। তাঁর সেই লেখার শিরোনাম ছিল 'লাইফ অব আ ড্রাইভার'। প্রতিটি

লেখাই পাঠকদের মধ্যে তুমুল আগ্রহের সৃষ্টি করল। তিনি ধারাবাহিকভাবে নিজের অভিজ্ঞতা লিখে যেতে থাকলেন। সেই ধারাবাহিক লেখাই জন্ম দিল একটি উপন্যাসের। এই উপন্যাসে তিনি বর্ণনা করেছেন একেবারে নিজের অভিজ্ঞতা। ফেসবুকে তাঁর এই ধারাবাহিক লেখা পড়েন অসমিয়া ভাষা আরু সফটওয়ার বিকাশ কেন্দ্রের স্বত্বাধিকারী অনিল বরুয়া। তিনিই বইটির প্রকাশক। ২৪ ডিসেম্বর গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে ৪৬৮ পাতার এই উপন্যাসের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। আর, প্রকাশের দিন পনেরোর মধ্যে আটটি মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে যায়।

আলফার কলঙ্কিত অধ্যায়

এবারের গুয়াহাটি বইমেলায় আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই 'আলফার কলঙ্কিত অধ্যায়'। লেখক রঞ্জু নেওগ হাজরিকা। বইটির সম্পাদনা করেছেন অমরদীপ বরুয়া। প্রকাশক সন্ত্রাসবাদী দ্বারা নির্যাতিত পরিবারবর্গের ট্রাস্ট। ১৫২ পাতার বইটিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে আলফার হত্যালীলার কিছু ঘটনা। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে শহিদ কুমুদ হাজরিকা খুনের বিবরণ। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ হতে থাকলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কুমুদ হাজারিকা খুনের ঘটনাটি। ১৯৯০ সালের ২৩ ডিসেম্বর। দক্ষিণ বিহপুরিয়া আমরা কাঁচিকটা গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে নৃশংস খুন করা হয়েছিল হাজরিকাকে। ঘটনার পর আটক এক আলফা জঙ্গি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিল। তার বিবৃতির সূত্রে অকুস্থল থেকে পচাগলা মাংস উদ্ধার করেছিল পুলিশ। রাজ্যের নানা স্থানে একইভাবে খুন করা হয়েছিল দুগ্ধ হাজরিকা, রাধানাথ বরা, গোলাপ বরা, নবীন শইকিয়া, লক্ষ্মীধর রাজবংশী সহ মোট ৪১ জনকে। এসব হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অসংখ্য পাঠক এবারের বইমেলায় এই বইটি সংগ্রহ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত অনেক পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলফার নীতিহীন, আদর্শহীন নৃশংসতার ঘটনা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

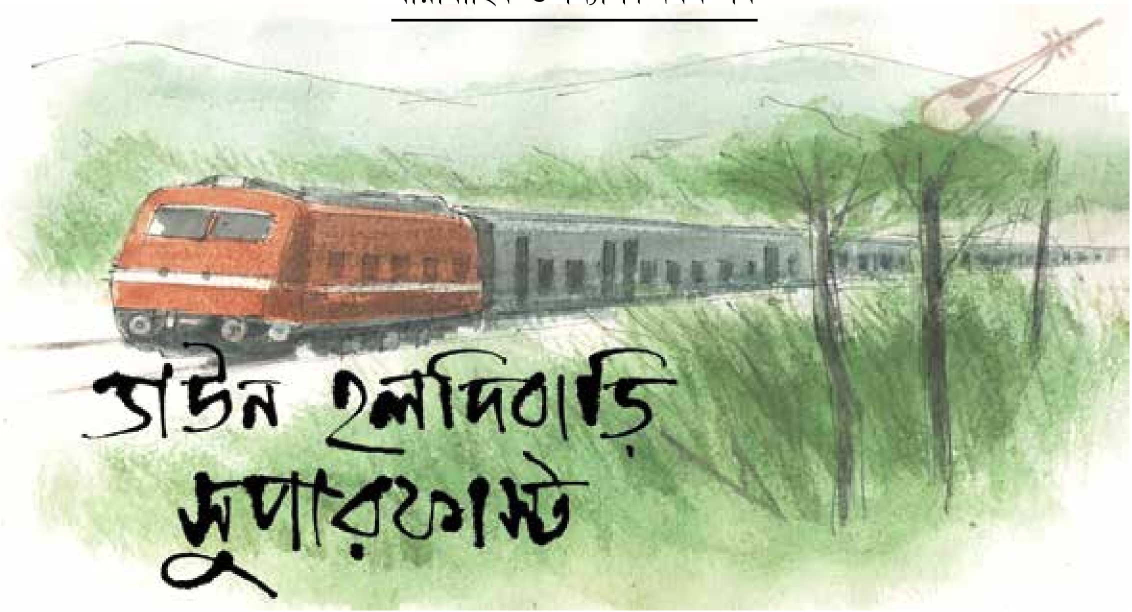

সুজিত দাস

একটা একশন হবে আর খবর চলে যাবে বিশেষ এক সংবাদমাধ্যমে। ছাপা হবে পরদিন সকালে। কেন? কী ভাবে রিভলবার, চোরাচালান-এর মত ক্রাইমের মধ্যে চলে আসে কবি ও কবিতা? হলদিবাড়ি প্ল্যাটফর্ম-এ নামা বিচিত্র যাত্রীর দল জড়িয়ে আছে এক রহস্যময় পরিমণ্ডলের মধ্যে। এখন অপেক্ষা করছে স্নায়ু টানটান অ্যাকশন! ধুন্ধুমার সুপারফাস্ট ছুটে আসছে! কিন্তু কাহিনী ফুরোচ্ছে না। উৎকণ্ঠার আরেক পশলা কুয়াশা জড়িয়ে ধরছে প্ল্যাটফর্ম।

১৭

উত্তরকোণের স্বর্ণচাঁপা গাছটা সোনালি ফুলে ভরে আছে। চাঁপার সুঘ্রাণে মেতে উঠেছে গোটা মধুকুঞ্জ। ইলা ব্যানার্জির বিশাল প্রাসাদে দুটো আলাদা ঘরে আরাত্রিকা আর বলবিন্দরের থাকার ব্যবস্থা। আলাদা ঘর কিন্তু মাঝে কমন লিভিং। ওখানে বসেই দুজনে কাজ করছে এখন। বলবিন্দর ভিডিও ক্লিপগুলোকে একটার পর একটা সাজাচ্ছে। আর ইলা লিখে চলেছে কুন্ডুর কারনামা। দু'এক দিনের মধ্যেই অপারেশন 'টোকে গেকো'। 'ট্রিপল আর' সৌরভ দত্তকে আলটিমেটাম দিয়ে রেখেছে। যে রাতে রেইড হবে সেদিনই দুপুরেই কপি পাঠিয়ে দেবে হাউসে। ভোরের প্রিন্টে খবর করবে 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'। তার আগেই মধ্যরাত থেকে পোর্টাল নিউজটা অন এয়ার করবে।

একটু আগেই মালতী এসে একপ্রস্থ স্ন্যাক্স দিয়ে গেছে। ইলা ব্যানার্জি খাইয়ে মেরে ফেলার একটা প্ল্যান করেছেন। ভদ্রমহিলা পারেনও বটে! বরাবরের স্বল্পাহারী আরাত্রিকা একদমই ভোজনরসিক না কিন্তু ও অবাক হয়ে যাচ্ছে বলবিন্দরকে দেখে। একটা আইটেমও বাদ দিচ্ছে না। সুপ্রভাত ওঁর 'সেলার' থেকে কয়েক বোতল স্কচ এবং গোটা দুই ওয়াইন রেখে গেছেন। এই মুহূর্তে বলবিন্দরের বাঁ হাতে সিঙ্গল মল্টের সোনালি তরল, ডানহাতের ফর্ক-এ গাঁথা একটি নিটোল বোরোলি মাছ। আর চোখ সামনে খুলে রাখা ম্যাকবুকে। এখন থেকেই স্টিল ফটো আর ভিডিও ক্লিপগুলো পাঠানো শুরু করে দিয়েছে। আরাত্রিকা অবাক হয়ে যায় মদ্যপানের পরও বলবিন্দরের এমন নিখুঁত কাজ দেখে। মানুষটা 'ফুডি' এবং মদ উপভোগ করে। অথচ একবিন্দু বাড়তি মেদ নেই শরীরে। সারাদিনে যে কোনও সময়ে একঘণ্টা দৌড়বেই দৌড়বে। এখন মধুকুঞ্জ থেকে বেরনো বারণ তাই ট্রেডমিলেই পঁয়তাল্লিশ মিনিট পাক্কা অ্যাথলিটের মত দৌড়ে নিচ্ছে। কপি লিখে ফেলার পর নিজের জন্য একটা গ্লাসে ওয়াইন ঢালে আরাত্রিকা।

'সো, আওয়ার চিফ রিপোর্টার ইজ ইন জলি মুড নাউ।' বলবিন্দর ম্যাকবুক থেকে চোখ তুলে আরাত্রিকার দিকে তাকায়।

'আমি তোমার মত হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার নই।' প্রথম চুমুকটা দেয় আরাত্রিকা।

'ম্যাডাম চিফ রিপোর্টার, আই ওয়ার্ক ফর ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড আই ওয়র্কআউট সো দ্যাট আই ক্যান ড্রিঙ্ক।'

'স্টিল ইউ মেন্টেইন ইয়োর ফিজিক লাইক এনিথিং। হাউ কাম, বলবিন্দর?'

'বিকজ তোমার দিকে তাকালেই আমার ভেতরে এনার্জি বার্ন আউট হয়। ও কুড়িয়ে, তেন্নু কি পতা নয়ি কি ম্যায় তেন্নু কিন্না পেয়ার করদা...'

'ইউ আর হাই, মিস্টার অরোরা।'

'ইউ কুড হ্যাভ টেকেন জিন ইন্সটেড অফ ওয়াইন।'

'কেন?'

'বিকজ, জিন ইজ আ গ্রেট লেগ ওপেনার, ইউ নো', নির্বিকার বলবিন্দর ম্যাকবুক থেকে একটা লম্বা ভিডিও পাঠানো শুরু করে।

'ইউ মেল শভিনিস্ট', হতবাক আরাত্রিকা রাগে গনগন করে ওঠে। কুশন ছুঁড়ে মারে বলবিন্দরের দিকে। এক চুমুকে শেষ করে ভরা ওয়াইনের গ্লাস। দ্বিতীয় গ্লাস আবার ভর্তি করে দ্রাক্ষারসে।

'খাও আরাত্রিকা, খাও। যত মদ, তত পথ, সোফা থেকে উঠে আরাত্রিকার উষ্ণ কানের লতিতে মুখ রাখে বলবিন্দর। উত্তর কলকাতার কুড়ি ইঞ্চি দেওয়ালে এখন অনেক ফাটল। এই মুহূর্তে পালকের মত ভাসতে থাকা আরাত্রিকাকে তীব্র এক আলিঙ্গন করে বলবিন্দর। মিতভাষী আরাত্রিকা, লাজুক আরাত্রিকা, গম্ভীর চিফ রিপোর্টার আরাত্রিকা ক্রমশ গলে যেতে থাকে। উত্তরকোণে চাঁপা ফুলের সুঘ্রাণ, বলবিন্দরের শরীর থেকে ঘাম, হুগো বস আর সিঙ্গল মল্টের লিথাল ককটেল। ভুলের বাসরঘর বোধহয় এভাবেই রচিত হয়। ফুলের শয্যাও।

এই ভর সন্ধ্যাবেলায় মধুকুঞ্জ থেকে একটু দূরে করলা নদীর চরে একজোড়া পাখি একসাথে ডেকে উঠল, 'ডিড ইউ ডু ইট, ডিড ইউ ডু ইট?'

'খবরিলাল' পোর্টালের ম্যানেজিং এডিটর প্রশান্ত কর আরও বেশ কয়েকটা নতুন জহর কোট কিনেছে। একটা কুয়োভাদিস জুতোও। শিলিগুড়িতে নতুন তৈরি হওয়া জে ডব্ল্যু ম্যারিয়ট হোটেলের কফিশপের একটি টেবিলে একা বসে প্রশান্ত। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে বাটা সুভাষের থেকে একটা ভারি খাম পায় প্রশান্ত। সঙ্গে ম্যারিয়টের কফি এবং কুকিজ। এত টাকা এবং এই এত দামি কফি প্রশান্তর জীবনে একটা নতুন এপিসোড। প্রতিবারই বাটা সুভাষ আসার কিছুক্ষণ আগেই প্রশান্ত চলে আসে। তারও একটা কারণ আছে। প্রতিমাসে এই দিনটায় নিজের প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করে প্রশান্ত। প্রতিবারেই জহর কোট বদলে নেয়। সঙ্গে লোকেশন স্টেটাস, 'প্রশান্ত কর ফিলিং হ্যাপি @ জে ডব্ল্যু ম্যারিয়ট, শিলিগুড়ি। তিনশো লাইক, গোটা চল্লিশ কমেন্ট। ইদানীং প্রশান্ত কমেন্টের উত্তর দেয় না। কমেন্টের উত্তর না দিলে বেশ সেলিব্রেটির মত মনে হয় নিজেকে। একটু বাদেই বাটা সুভাষ আসবে এইখানে, হাতে মাসকাবারির

মোটা খাম নিয়ে। এমনিতে প্রশান্ত করের মুখ তুবড়ির মত চলে কিন্তু বাটা সুভাষকে দেখলেই শিরদাঁড়া দিয়ে কেমন একটা ভয়ের স্রোত নেমে যায়। মানুষটা কথা কম বলে, এমনভাবে তাকায়, মনে হয় ভেতরটা এক্স-রে করে নিচ্ছে। ওই নিথর ঠান্ডা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না প্রশান্ত। অথচ গতমাসে ওর চোখ অপারেশনের পুরো টাকাটাই বাটা সুভাষের দেওয়া। প্রশান্ত জানে সুভাষ টাকা দেবে, জে ডব্লু ম্যারিয়টে খাওয়াবে কিন্তু বেশি কথা বলবে না এবং কাজ বুঝে নেবে ষোলোআনা। সুভাষ আসার আগেই মনটা ভাল করে নেওয়ার জন্য একটু বোলচাল মেরে নেওয়া দরকার। একটু আধটু লেকচারবাজি করলে মনটা ফুরফুরে থাকে। আরও মিনিট কুড়ি সময় আছে হাতে। নতুন এসডিপিও-কে ফোনে ধরে প্রশান্ত,

'সাহেব কেমন আছেন?' আজকাল সিনিয়র অফিসারদের স্যর বলে না প্রশান্ত। সাহেব বলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো রপ্ত করে নিচ্ছে। 'প্রিন্ট'-এর সাংবাদিকদের দেখে শিখছে এসব।

'হ্যাঁ, প্রশান্তবাবু বলুন', সৌরভ বোঝে লোকাল পোর্টালের এই সাংবাদিক বেশ জ্বালাবে এখন। প্রচুর মিথ্যেও বলবে। এই ধরনের জার্নালিস্টকে হ্যান্ডেল করার কোনও ট্রেনিং ওদের দেওয়া হয় নি। এটাও একটা লার্নিং প্রসেস। এদের চটানোও যাবে না কারণ যত ছোটই হোক, ন্যুইসেন্স ভ্যালু আছে প্রশান্ত ধরের।

'না, মানে ম্যারিয়টে আছি। কফি লাউঞ্জে। একবার আসবেন নাকি? আধঘণ্টা বাদে। ক্যালমোর কফি হয়ে যাক এককাপ করে। প্রশান্ত জানে দশ মিনিটের বেশি বাটা সুভাষ এখানে থাকবে না তাই রিস্ক নিয়ে বলেই ফেলে।

'প্রশান্তবাবু, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো একটু ব্যস্ত, বিকেলেই আইজি সাহেবের সঙ্গে মিটিং আছে। থ্যাঙ্কস, এনিওয়ে।'

'আপনার আইজি সাহেবকে আমি সরিয়ে দেবো এই পোস্টিং থেকে। উনি কি পোর্টালের জার্নালিস্টদের মানুষ বলেই মনে করেন না। সেদিন দার্জিলিং মে-ফেয়ার হোটেলে প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সবাইকে ডেকে কনফারেন্স করলেন, শুধু পোর্টাল বাদ!'

'বটেই তো, খুব খারাপ কাজ করেছেন উনি। তা পারলে সরিয়েই দিন। এত দুঃসাহস সামান্য একজন আইজির হয় কী করে', সৌরভ খেলতে শুরু করে প্রশান্তকে নিয়ে।

'দেখি, সামনের সপ্তাহেই ফ্লাইটের টিকিট কাটা আছে, হোম সেক্রেটারিকে ওর সম্পর্কে অ্যাপ্রাইজ করতে হবে। বড় বাড় বেড়েছে লোকটা।'

'একদম। আপনার মত মান্যগণ্য সাংবাদিককে এভাবে ইগনোর করলে ফল তো ভোগাই উচিত', সৌরভ কনফ্রন্টেশনে না গিয়ে প্রশান্তকে অন্যভাবে ফ্রাস্টেট করে। এটা এখন সৌরভের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট পাসটাইম।

'ওকে দাত্তা সাহেব, রাখছি। সম্ভব হলে আপনার আইজি সাহেবকে বলে দেবেন। আমার কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ম্যারিয়ট কফিটা ভালই বানায়।'

ফেসবুকের দিকে তাকায় প্রশান্ত। এই বাসন্তী রঙের জহর কোট পরা প্রোফাইলে দশ মিনিটেই পঁচাত্তরটা লাইক। ভাবা যায়! হৈমন্তী কমেন্ট করেছে, ইউ লুক অসাম। অল্পবয়েসি এই কবিকে ইদানীং অনেক রাত অবধি মেসেজ করে প্রশান্ত। হাতে আরও মিনিট পাঁচেক সময় আছে। ফাস্ট ডায়াল করে প্রশান্ত,

'হাই হৈমন্তী, কেমন আছো?'

ভাল আছি দা, তুমি তো আজকাল পিং-ই করো না। বিজি জার্নালিস্ট বলে কথা।'

'আর বোলো না। এদিকে খবরের চাপ ওদিকে সেভ ইন্ডিয়ার কাজ নিয়ে ঘেঁটে ঘ হয়ে আছি। শোনো, একটা ভাল সুযোগ এসেছে। গণেশপ্রকাশজির সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমাকে ন্যাশনাল টিভিতে প্যানেল ডিসকাশনে বসিয়ে দেব খুব শিগগিরই। ইনফ্যাক্ট আমাকেই বলেছিল কারণ এত ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি বলার লোক তো বিশেষ নেই কিন্তু আমার সময় কোথায় বল?'

'ইউ আর গ্রেট প্রশান্তদা। রাতে ভিডিও কল কোরো প্লিজ', আদুরে গলায় বলে হৈমন্তী।

'ওকে সোনা, রাখি এখন', দূর থেকেই বাটা সুভাষকে দেখতে পায় প্রশান্ত। আজ মোটা খাম পাওয়ার দিন। আজ আবার নতুন কাজের অ্যাসাইনমেন্ট। প্রশান্ত জানে, এখানে কোনও চুদুরবুদুর চলবে না। সুভাষের প্রতিটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে

হবে। শিরদাঁড়া ক্রমশ ঠান্ডা হতে শুরু করে।

গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে সোহিনী রাঠোরের কেবিন ব্যাগে একটা ছোট্ট যন্ত্র চুপচাপ শুয়ে ছিল। ছোট ব্রিফকেসের মত সাইজ। ইজরায়েলি মেশিন। মেশিন তো নয়, অন্তর্যামী। মানুষের মন পড়ে নিতে পারে। এখন মন মানেই মেসেজ। মিলন গোম্বু এই যন্ত্রটাই সার্কিট হাউসে তুলে দিয়েছিল সোহিনীর হাতে। রাধারানি অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন এমন একটি ডিভাইস। হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার কল থেকে স্বাভাবিক ফোনকল, মেসেজ প্রায় সবকিছুই ইটারসেপ্ট করা যায়। তবে মেশিনের ভার্সানটা ছোট বলে একসাথে পাঁচটার বেশি কল মনিটর করা যায় না। মোটমাট, যাদের ওপর নজর রাখা দরকার তাদের মনের কথা পড়ে নিতে পারছেন এখন 'ট্রিপল আর'। গুয়াহাটি থেকে খানিকটা দূরে একটা মাঝারি মানের পিজি হোস্টেলে বসে এইসব মনিটর করছেন রাধারানি। আরও দুটি মেয়ে ল্যাপটপে ট্র্যান্সক্রিপ্ট করে রাখছে সার্ভেল্যান্সের সব কথোপকথন। এই অন্তর্যামী যন্ত্র থেকে প্রয়োজনে ভয়েস ডিস্টর্ট করে কথাও বলা যায়। সুবিধে এই, কেউ ট্র্যাক করলে জোনটা বোঝা যাবে কিন্তু পিনপয়েন্ট করা অসম্ভব কারণ মেশিন নিজের থেকেই প্রতি নয় সেকেন্ড অন্তর অন্তর লোকেশন হপিং করে। ইনবিল্ট টেকনোলজি।

সৌরভ অনেক চেষ্টা করেও লোকেশন পিনপয়েন্ট করতে পারে নি। এটুকু বুঝেছে মহিলা কণ্ঠের উৎস আসাম থেকে। এর বাইরে কিচ্ছু বোঝা যায় নি। আজকের মধ্যেই সবটাই অ্যারেঞ্জ করে ফেলতে হবে। ফোর্স মোবিলাইজেশন থেকে প্লেন ক্লোদ ডিপ্লয়মেন্ট... সবটাই। আইজি সাহেব পারমিশন দিয়েছেন কিন্তু সৌরভ জানে জুরিসডিকশন ওভারল্যাপ করে কাজ করাটা কতটা কঠিন। একই র‍্যাঙ্কের ফেলো অফিসারকে না জানিয়ে তার এলাকায় গিয়ে অপারেশন করলে ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু ওই মহিলা কণ্ঠের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে করে এটুকু বুঝে নিয়েছিল সৌরভ যে কলটা হোক্স নয়। মহিলার টোনটা অসম্ভব শীতল এবং কনফিডেন্ট। শি মিনস্ বিজনেস। তাছাড়া চম্পাসারিতে ভুটানি মদ ভর্তি ট্রাক লুঠের কাহিনি সৌরভের জানা। আজকের মধ্যেই মহিলার আরেকটি কল আসবে, নিশ্চিত। একজ্যাক্ট লোকেশন না পেলেও হরেন কুন্ডুর নামটা এসেছিল কথোপকথনে। হরেন কুন্ডুর পলিটিকাল ক্লাউট সবাই জানে। সামান্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার সব মাথা কুন্ডুর পকেটে। লোকটা পলিটিকাল কিং মেকার। তাই এরিয়াটার মোটামুটি একটা আন্দাজ করে ফেলেছে সৌরভ। তাতে করে এটুকু বুঝেছে এই অপারেশনের পর কী অসম্ভব রাজনৈতিক রিপার্কাশন তৈরি হবে। আইজি সাহেবও জানেন সেইকথা। এমন সিচুয়েশনে মিলন গোম্বুই সৌরভের 'সঞ্জয়'। জুনিয়র অফিসার হলেও

হরেন কুন্ডুর হার্ডওয়্যার দোকানের ঠিক পাশেই একটা ছাতিম গাছ আছে। আধো অন্ধকারে হেলমেট পরা অবস্থায় ওই ছাতিম গাছের নিচে জলবিয়োগ করার অছিলায় দাঁড়ায় হরি। তক্ষকগুলো হরেনের হার্ডওয়্যার দোকানের পাশে একটা ছোট্ট গুদামে রাখা আছে। পেচ্ছাপ করে মোবাইলটা সুইচ অফ করে এইচ ডি।

এত অভিজ্ঞতা মানুষটার, ঠিকঠাক গাইড করতে পারেন। ইন্টারকমে ফোন করে নিজের চেম্বারে গোম্বুকে ডেকে গোটা ঘটনাটা ব্রিফ করে সৌরভ।

'স্যর, ওই মহিলার নেক্সট ফোনকল না আসা অবধি তো আমরা হেল্পলেস।', মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠেন মিলন।

'জানি ডিএসপি সাহেব। যে কোনও সময়েই ফোনটা আসবে। আমাদের এন্ড থেকে কনফার্মেশন পেলেই উনি লোকেশন পাঠাবেন। তবে কুন্ডুর কোর এরিয়ায় কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। তাতে করে মোটামুটি

একটা ধারণা হয়েছে। আপনি সংখ্যায় খুব কম কিন্তু রিলাইয়েবল ফোর্স ডিপ্লয়মেন্টের কথা ভাবুন। যা মনে হচ্ছে আজ রাতেই রেইড করতে হবে।'

'রাইট স্যর', বুটের শব্দ তুলে স্যালুট ঠুকে নিজের চেম্বারে ফিরে গেলেন মিলন গোম্বু।

ঠিক শেষ বিকেলে ফোনটা এল।

সেই শীতল এবং ডিস্টর্টেড কণ্ঠস্বর, 'আপনি অনেকটা কাজ গুছিয়ে ফেলেছেন, দাত্তা সাহেব। উই আর রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। আপনার হোয়াটস্ অ্যাপে একটু বাদেই একটা মেসেজ যাবে। লাইভ লোকেশন।

'বেশ আপনি যখন এতটাই ভরসা করেছেন আমার জন্য একটা ছোট্ট ফেভার আশা করি করবেন।'

'বলুন দাত্তাসাহেব, আই অ্যাম হেলবেন্ট টু মেক দিস রেইড সাকসেসফুল', মহিলা কণ্ঠের উত্তর।

'আপনার লোকাল সোর্সের একটা ফোন নম্বর অন্তত আমাকে দিন। যে স্পটের আশপাশে থাকবে। জরুরি দরকারে যার সাহায্য আমি পেতে পারি। রেস্ট অ্যাসিওর্ড, সেই নম্বর গোপন থাকবে।'

'যে নম্বর থেকে লাইভ লোকেশনের মেসেজ পাবেন ওই নম্বরটাই আমার লোকাল সোর্স। আপনার অপারেশন শেষ হলেই নম্বরটা ডিঅ্যাকটিভেট হয়ে যাবে। আপনাকে আমি ভরসা করি দাত্তাসাহেব, তবে সাবধান থাকাটা আমাদের থাম্বরুল। বাই, অল দ্য বেস্ট।'

যে কোনও অ্যাকশনের আগেই খুনিয়া মোড় হাতছানি দেয় এইচ ডি-কে।

খানিক আগেই জায়গাটা একবার রেকি করে এসেছে হরি। হরেন কুন্ডুর হার্ডওয়্যার দোকানের ঠিক পাশেই একটা ছাতিম গাছ আছে। আধো অন্ধকারে হেলমেট পরা অবস্থায় ওই ছাতিম গাছের নিচে জলবিয়োগ করার অছিলায় দাঁড়ায় হরি। তক্ষকগুলো হরেনের হার্ডওয়্যার দোকানের পাশে একটা ছোট্ট গুদামে রাখা আছে। পেচ্ছাপ করে মোবাইলটা সুইচ অফ করে এইচ ডি। ছাতিম গাছের ঠিক কোনখানে এই মোবাইলটা রাখতে হবে, আগেই বলে দিয়েছে শুক্রা। শুক্রা ওঁরাও আজ পুলিশ রেইড-এর সময় অবধি স্পটের কাছেই থাকবে, হরেনের পার্টি অফিসে। রাত বারোটা অবধি ক্যারম খেলা চলে ওখানে।

খুনিয়া মোড়ে দিনের আলো একটু আগেই নিভে আসে। এখানে জঙ্গলের ঘনত্ব একটু বেশি। সন্ধ্যা একটু বেশিই কালো। শেফালির মসৃণ ত্বকের থেকেও কালো। ফরেস্ট বিট অফিসে বাইক পার্ক করে শেফালির দরজায় নক্ করে এইচ ডি। সেই একই দৃশ্য। অবাধ্য আঁচল, অন্তর্বাস ছাড়া ব্লাউজ আর দু'হাত ওপরে তুলে চুল ঠিক করার পরিচিত দৃশ্যাবলী। কষ্টিপাথরের নারীটির মুখে সেই মৃদু হাসি, চোখে একই রকম ইঙ্গিত, শরীর থেকে বনতুলসি ফুলের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ। তবু শেফালিকে কখনো পুরনো মনে হয় না হরির।

'আজ তোর ভেতরের ঘরে একটু একা বসব শেফালি, কিছু কাজ আছে।'

'কাজ আর কাজ। তুমি কি আমাকে আর ভালবাসো না, হরিদা?'

'আজ রাতে চাঁদ উঠবে, শেফালি। আজ প্যাঁচারা রাতে ঘুমোবে। শুধু তুই আর আমি জেগে থাকব।'

'অত কঠিন কথা আমি বুঝি না গো, হরিদা। শুধু তোমাকে চাই। মাঝে মধ্যে অন্তত এসো।' শেফালির আঁচল আরও বেশি বেশি করে অবাধ্য হতে শুরু করে।

'আপাতত আমাকে এক পেগ ভ্যাট সিক্সটি-নাইন দে। ঠিক একপেগ। কিছু কাজ করার আছে এখন।'

'বেশ, আজ তবে 'সিক্সটি-নাইন', শব্দ না করে হেসে ওঠে শেফালি, 'তুমিই শিখিয়েছিলে ওই পোজ।'

শুক্রা স্পটে থাকবে। এসডিপিও সাহেব শিলিগুড়ি থেকে স্টার্ট করলেই শুক্রার মোবাইলে হরি ফোন করে অ্যালার্ট করবে। তখন থেকেই ছাতিম গাছে রেখে আসা ওই মোবাইলটা অন হবে। দাত্তাসাহেব সরাসরি যোগাযোগ করবেন ওই মোবাইলে। ডিএফও সাহেবও আজকের রেইড-এ থাকবেন। বলবিন্দরের দুটো ভিডিও হরির কাছেই আছে। শুক্রা-কেও বলা আছে রেইড-এর সময় সম্ভব হলে একটা দুটো ছবি তুলে হরির মোবাইলে পাঠাবে। তারপর সেগুলো প্রশান্তকে পাঠাতে হবে। আজ শেষ রাত থেকেই

প্রশান্ত করের 'খবরিলাল' আর 'দ্য ডেইলি এশিয়ান এজ'-এর পোর্টালে এই খবর চালু হয়ে যাবে। প্রিন্ট ভার্সানে 'দ্য ডেইলি এশিয়ান এজ' কাল ভোরেই এটা নিউজ করবে সবার আগে।

তোমার দিন ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, হরেন কুন্ডু। একটি পেগই এখন নেবে হরি। এবং নিট। নিট উইথ নো জাঙ্ক।

১৮

মধুপুর শহরে হৈ হৈ কান্ড, রৈ রৈ ব্যাপার।

ম্যাডাম ডিএম শ্রীমতি আরতিরানির প্রথম কবিতার বই বেরোবে। 'প্রেমের বিছানায় সজারুর কাঁটা'। কালেক্টরেটের নাজিরবাবু ইতোমধ্যে গলদঘর্ম। কলকাতার প্রকাশকের জন্য সার্কিট হাউসের সবচাইতে ভাল ঘরটি রেডি করেছিলেন কিন্তু একজন মন্ত্রী এসে পড়েছেন। তাই সেকেন্ড বেস্ট রুমটি বরাদ্দ হয়েছে। আরতিরানি এই ব্যাপারে প্রচণ্ড অখুশি। ডিএম সাহেব কোনওমতে ম্যানেজ করেছেন বউকে,

'আহা আরতি, আফটার অল মন্ত্রী মহোদয় আসছেন। ডেট না কোলাইড করলে তো এক নম্বর স্যুইটটাই রুপাংশুবাবুর জন্য রাখতাম আমি। একটু বোঝো, সুইটহার্ট।'

'আরে রাখো তোমার ডিএম গিরি', ঝাঁঝিয়ে ওঠেন আরতিরানি, 'হাজার হাজার কবি তবু মাত্র ষাট হাজার টাকায় আমার চারফর্মার কবিতার বই বের করছেন উনি। একবার ভাবো শুধু!'

'ভেবো না আরতি, এক আর দুই নম্বর স্যুইটের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। নাজিরবাবু নতুন কমোড, নতুন গিজার বসিয়ে দিয়েছেন ওই রুমে।'

'হ্যাঁ, কমোডের ব্যাপারটা একটু দেখো। রুপাংশু-দার কন্সটিপেশন আছে।'

'বটেই তো, দেখব না মানে, আলবৎ দেখব। এমন কমোড বসিয়েছি একবার বসলেই ক্লিয়ার। বেষ্ট সেরামিক কমোড। রুপাংশুদার কোনও অসুবিধে হবে না। আই প্রমিজ।'

'আর শোনো, তোমার সব অফিসারদের বলবে সেদিন স্যুট-টাই পরে আসতে। ঘোষক আর গেস্টদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা কোরো', আদুরে গলায় বলে ওঠেন আরতিরানি, 'ইট ভাটা আর চা বাগানের মালিকদের নেমতন্ন কোরো। 'প্রেমের বিছানায় সজারুর কাঁটা'-তে সেদিন টেন পার্সেন্ট ছাড়।

'ও নিয়ে ভেবো না ডার্লিং, ওসব হয়ে যাবে। তবে চা বাগানের অবস্থা তো খুব একটা ভাল না। ওদের ডাকব?

'বেশ, তবে রাইস মিলের মালিকদের ডেকো। আর হ্যাঁ, অপাপবিদ্ধা আর তথাগত সেদিন কিন্তু টোটো চেপে আসবে না। ওদের জন্য কালেক্টরেটের পুলকার বলে দিও। 'খবরিলাল' পোর্টালের ম্যানেজিং এডিটর প্রশান্ত করের জন্য একটা ফরচুনার পাঠিও। অলরেডি আমার বইয়ের একটা প্রোমো বের করে দিয়েছে'।

সাদা জামা নীল প্যান্টের ইউনিফর্মে ডিএম সাহেব ঘেমে নেয়ে একাকার। মাঝেমধ্যেই নিজের কপালকে দুষছেন। আসলে এই মধুপুরে পোস্টিং নিয়ে আসাটাই কাল হয়েছে ওর। শহরটার এমনই মায়া এখানে একবার এসে পড়লেই মনের ভেতর কবিতার ঢেউ ওঠে। ওই তো কবিতা লেখে আরতি। কিছুই বোঝেন না আগামাথা। তবে লোকে এত এত প্রশংসা করে, নিজেও বউয়ের কবিতা শুনে বাহ্ বলে ওঠেন। কালেক্টরেটে সিংহ হলেও বাড়িতে ডিএম সাহেব একেবারে শ্রাবণের বেড়াল। এই ডিসেম্বরেও গায়ের থেকে লেপ সরিয়ে দেন উনি। মাথা এবং পেট দুটোই গরম। শালা, নাম কী কবিতার বইয়ের! 'প্রেমের বিছানায় সজারুর কাঁটা'! নিজের বিছানাতেও অজস্র সজারুর কাঁটা বিছিয়ে রাখা আছে যেন।

কোথাকার কে রুপাংশুদা, তার জন্য কমোড বদলাতে হচ্ছে এখন!

ধিক এই ডিএম জন্ম।

শিলিগুড়ি থানা থেকে মাত্র একজন এসআই এবং দু'জন কনস্টেবল। বাকি ফোর্স ডাবগ্রামের ব্যাটালিয়ন থেকে সিলেক্ট করলেন মিলন গোস্বু। রাজাভাতখাওয়া থেকে দশ জন ইএফআর জওয়ানকে রিক্যুইজিশন করলেন সেবক ব্রিজে নাকা চেকিং-এর নাম করে। সঙ্গে দাত্তা সাহেবের নিজস্ব কমব্যাট ফোর্স। সব মিলিয়ে

ত্রিশজন আর্মড কনস্টেবল। চারজন অফিসার। এছাড়াও এসডিপিও সাহেব একটু আগেই ডিএফও সাহেবকে ফোন করে রেডি থাকতে বলেছেন। ওঁর বডিগার্ড এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দুজন অফিসার। লোকাল বিএলআরও-কে বলে রাখা আছে, একজন আমিনকে তৈরি রাখার জন্য। গোটা মোবিলাইজেশনটাই খুব সন্তর্পণে করা হচ্ছে। কুন্ডুর নেটওয়ার্কও তেল খাওয়া মেশিনের মতই চলে। তাই একসঙ্গে সবাই একজায়গা থেকে স্টার্ট করবে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোর্স এমনভাবে রওনা দেবে যাতে ঠিক রাত সাড়ে দশটায় চালসার বড় রিসর্টটার সামনে মিট করতে পারে। সাড়ে দশটা মানে দশটা উনত্রিশ মিনিট ষাট সেকেন্ড। ওখান থেকে মাটিয়ালি বাজারের দূরত্ব ফাঁকা রাস্তায় বড়জোর বারো তেরো মিনিট।

ক্যারম খেলা চলছে সঙ্গে মদ্যপানও। শুক্রা আজ আর বেশি খাবে না। রাত নয়টায় হরেন কুন্ডু বেরিয়ে গেছে হার্ডওয়্যারের দোকান ছেড়ে। যাওয়ার আগে নাইটগার্ড পঙ্কজকে বলে গেছে, 'আজ রাতটা একটু জেগে থাকিস বাবা। কাল দুপুরেই ইয়েগুলো সব ডেলিভারি হয়ে যাবে। আজকের রাতটা আর ঘুমাস না। দুর্গা, দুর্গা। হরেন বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পরেই মালগুলো একবার দেখে নিয়েছে শুক্রা। একদম ঠিক যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। নয়টা পাঁচ দশ নাগাদ পেচ্ছাপ করার নাম করে একবার ছাতিমতলায় যায় শুক্রা। নতুন মোবাইল থেকে হরিদা-কে ফোন করে,

'তিনশো ছাব্বিশটা টিকটিকিই রাখা আছে। এসডিপিও-কে লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে দিলাম। যদি সম্ভব হয় অ্যাকশনের সময় পারলে দু-একটা ভিডিও তুলে তোমায় পাঠাব।'

'শোন, তারপরেই ফোন থেকে সিমটা বের করে ভেঙে ফেলবি আর ফোনটাকে ফেরার সময় রকি আইল্যান্ডে ফেলে দিস। ফোনের মায়া করিস না। রিস্ক নিতে হলে নিস কিন্তু স্পট থেকে অ্যাকশনের ছবি পাঠাস।'

চালসা মোড় পার করে বাঁয়ে পাহাড়ি রাস্তা শুরু। সৌরভের জিপসি ঠিক নয়টা কুড়িতে বড় রিসর্টের সামনে দাঁড়ায়। হেডলাইট অফ। এইখানে সব গাড়িকেই আলো বন্ধ করে আসতে বলা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি গাড়িগুলো এসে পড়বে। লাইভ লোকেশনের মেসেজটা পাওয়ার পরই সবাইকে অ্যাকটিভেট করে দিয়েছে। কারোরই দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। সৌরভের ড্রাইভার, সুশান্ত রসেইলি ছেলেটি তুখোড় স্মার্ট। ওর কাছে একটা ভাল মোবাইল দিয়ে রেখেছে ও। ছবি তোলার জন্য। প্রশান্ত করকে কয়েকটা অ্যানোনিমাস ভিডিও পাঠাতে হবে। বোলচাল দিলেও ওর পোর্টাল কাজে আসে। এখন ম্যাডাম আননোন-এর লোকাল সোর্সের ফাইনাল কলের অপেক্ষা।

এবং সেই ফোন আসার পর বারোটি গাড়ির কনভয় নিঃশব্দে এগিয়ে চলে মাটিয়ালি বাজারের দিকে। কুন্ডু হার্ডওয়্যাররের পাশে, নয়ানজুলির ওপরে পার্টি অফিস। তার থেকে দশ গজ দুরেই কুন্ডুর ছোট্ট একটা গুদামেই তিনশো ছাব্বিশটা জীবন্ত তক্ষক পাওয়া গেলো। গোটা অপারেশনে কোনও রেজিস্ট্যান্স নেই, ঝামেলা নেই। সুশান্ত রসেইলি নিখুঁত ভিডিও তুলেছে। ডিএফও সাহেব সিজার লিস্ট ড্র করেছেন। বিএলএলআর ও অফিসের আমিন কনফার্ম করেছে গুদামটা রেকর্ডেড ল্যান্ড এবং হরেন কুন্ডুর। নতুন ডিএফও সাহেব সঙ্গে করে শিলিগুড়ি থেকে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ অনিমেষ ঘোষকে নিয়ে এসেছিলেন, উনি এবং একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার এখন ওই তিনশো ছাব্বিশটা তক্ষকের দেখাশোনা করছেন। জমির মালিকানার বিষয়ে কোর্টে ভবিষ্যতে প্রশ্ন উঠবে তাই বিএলআরও অফিসের আমিনকে দিয়ে সিজার লিস্টে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্যারম খেলছিল যে কয়েকজন ছেলে তাদের একজনকে অ্যারেস্ট করা গেছে। নাইটগার্ডকেও। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে লোকাল থানাকে ডেকে নিয়েছে সৌরভ। এরপর কুন্ডুর বাড়িতে রেইড করে গোটা টিম। কুন্ডুকে পাওয়া যায় নি। শুধু একটা অ্যালবাম এবং গোটা দুই ডায়েরি পাওয়া গেছে। অ্যালবাম ভর্তি মেয়েদের ছবি। আর ডায়েরিটা একটা রত্নভাণ্ডার। কুন্ডু কাকে কাকে টাকা আর মেয়ে সাপ্লাই করত তার ডিটেলস। কোনও নাম নেই সেই ডায়েরিতে! কোর্টে প্রোডিউস করার করার আগেই এককপি করে জেরক্স করিয়ে রাখতে হবে, নিজের মনেই ছকে রাখে সৌরভ।

রাত দশটা নাগাদ পুলিশের গাড়ি দেখে হরেন কুন্ডুর নিজস্ব পার্টি অফিসের সামনে যে যুবকেরা ক্যারম খেলছিল তারা সবাই ছিটকে গেলেও একজন ধরা পরে। আর একজন, নয়ানজুলি টপকে একটা ঝোপের আড়াল থেকে গোটা রেইড-এর ছবি নিজের নতুন মোবাইলে রেকর্ড করে এইচডি-কে পাঠিয়ে দেয়। শুক্রার কাজ শেষ। এখন ওকে কয়েকদিন গা-ঢাকা দিতে হবে। হরিদা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

এই সময়টায় রাতচরা পাখি আর শেফালিকে বাদ দিলে খুনিয়া মোড়ে কেউ জেগে থাকে না। কিন্তু আজ আরও একজন জেগে আছে শেফালির সঙ্গে। এবং শেফালিকে স্পর্শ না করেই। এই মানুষটাকে আমরা চিনি।

এইচ ডি। হরিদাস সাহা।

লোকাল করেস্পন্ডেন্ট, 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'। সম্পাদক, 'জলঢাকা নিউজ।'

শেফালির নিঃশ্বাসের উষ্ণতা, অবাধ্য আঁচলের হাতছানি এতক্ষণ উপেক্ষা করে একটি অথবা কয়েকটি মেসেজের অপেক্ষায় ছিল এইচ ডি। শুক্রার থেকে বেশ কয়েকটা ছবি আর ভিডিও মোবাইলে ঢুকে যাওয়ার পরই প্রশান্ত কর আর আরাত্রিকা ম্যাডাম-কে ফরোয়ার্ড করে সেইসব। এরপর সিম বের করে ভেঙে ফ্যালে হরি। মোবাইলটাকে শেফালির রান্নাঘরে নিভু আঁচে জ্বলতে থাকা উনুনে ঢুকিয়ে দেয়। টেকনোলজি পায়ের ছাপ রেখে যায়, মিলন গোস্বামী বারবার বলেন এই কথাটি।

এতক্ষণ বাদে শেফালিকে অনুভব করে হরি। কষ্টিপাথরে তৈরি একটি নারী। খাজুরাহো ডান্স ফেস্টিভাল থেকে উঠে আসা একটি নিখুঁত মুদ্রার ডাকনাম শেফালি। আসলে একটি নয়, অনেক নৃত্যরত মুদ্রা দিয়ে বানানো একটা কোলাজের ভালনাম শেফালি। সেই কোলাজের খাঁজে খাঁজে বিট অফিস থেকে ভেসে আসা প্রাচীন লগের ঘ্রাণ, কাঠের উনোনের ধোঁয়া, কাচের গ্লাস ভর্তি ভুটানি মদ... সব মিলেমিশে একাকার। শেফালির সঙ্গে কাটানো সময়ে কথার কথক নেই, হিসেবের খাতা নেই। নেই লজ্জা নামের সাতনরী হারটিও।

ইনডং নদীতে এখন চাঁদ মিশে গেছে।

কাঁঠালিচাঁপা আর বনতুলসী ফুটে আছে মূর্তি নদীর আশেপাশে।

এবং তরুবালা জেগে আছেন।

করোনেশন ব্রিজ পার করার পরই সৌরভ বুঝতে পারে নেট দুনিয়ায় এই খবর ছড়িয়ে গেছে দাবানলের মত। প্রশান্তের 'খবরিলাল' আর 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'-এর পোর্টালেই বেরিয়েছে ভিডিও এবং ছবি। এখন রাত দু'টো। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই খবর। 'দ্য ডেইলি নিউ এজ' হরেন কুন্ডুর রাজনৈতিক ক্লাউট নিয়েও একটা প্রতিবেদন বানিয়েছে। সঙ্গে তক্ষক ধরার নিখুঁত ভিডিও এবং খুঁটিনাটি সব কিছুর ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স। সৌরভ বুঝতে পারে রাঙ্গাপানির গ্লোবাল কেমিক্যালস-এ বিস্ফোরণ, রিসর্টে হাতির তাণ্ডব এবং তক্ষক পাচারচক্রের ওপর এই অতর্কিত রেইড সবটাই একটা বিনি সুতোর মালা। 'আ ফিউ গুড সোলস'-এর কনসার্ট।

এই সিমফনি ডুয়ার্স জুড়ে বাজবে এখন।

রসেইলির কাছে রাখা মোবাইল থেকে সেই ম্যাডাম 'আননোন'-কে কয়েকটা ভিডিও মেসেজ করে সৌরভ। সঙ্গে ছোট্ট একটি লাইন, 'ম্যাডাম রাধারানি অ্যালিয়াস 'ট্রিপল আর', ন্যাশনাল পোর্টালের জন্য আপনার লোক অ্যাকশনের খুব ভাল ছবি তুলতে পারেনি তাই আমিই কয়েকটি পাঠালাম অন কন্ডিশন অফ অ্যানোনিমিটি। যদিও আপনার পরিচয় আমি জেনে গেছি। বাট ইট উইল বি আ সিক্রেট।'

অফিসের সামনে রুদ্রপলাশ গাছটা থম ধরে আছে এই ভোর রাতে। গোটা অফিসে একা সৌরভ। নীচে ড্রাইভার সুশান্ত রসেইলি এবং দু-একজন কন্সটেবল। এই শেষরাতে, মহানন্দা নদীর মার্কারি ভেপার এবং ঘুমন্ত হিলকার্ট রোডকে সাক্ষী রেখে দুটো ডায়েরিরই নিখুঁত ফটোকপি করে সৌরভ। ট্রিপল আর, রাধারানি এবং কোড গ্রিন এই তিনটে ডটকে মেলাতে পারছে এখন।

আপাতত দু'ঘণ্টার একটা ঘুম দরকার। ইট উইল বি আ লং ডে টুমরো।

(চলবে)

রায়দের কুঞ্জকুটিরে

অরণ্য মিত্র

রায়েরা ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। বড় জমিদারি না হলেও নেহাৎ মন্দ নয়। প্রজাবৎসল জমিদার বললে অত্যুক্তি হবে, কিন্তু রায়দের অনায়াসে ভাল জমিদার বলা যেত। যে সময়ের গল্প বলছি সেটা স্বদেশী আমল। অনন্তবিহারী রায়ের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। জমিদারির প্রবর্তক হেরম্ব রায়ের নাতি হিসেবে রাজ্যপাট সামলাচ্ছিলেন। দেশের প্রভুদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল অনন্তবিহারীর। তিনি মনের গোপনে 'রায়বাহাদুর' খেতাব লাভের আশা নিয়ে কলকাতায় যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর ছেলে আঠার বছরের গগনবিহারী কলেজের ছুটিতে বাড়ি এসেছেন সদ্য। ধু ধু গরমের সময়। গগনবিহারী গরমের ছুটিতে দেশের বাড়িতে ফেরার কথা প্রথমে ভাবে নি। তাঁর মত বদলানর কারণ ছিল রেজিনা নামের এক যুবতী। নায়েব তারিণী মুখুজ্জে এই সংবাদ তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে। অবশ্য টেলিগ্রামে

তিনি লিখেছিলেন ‘ফাউন্ড সফট বার্ড’।

জমিদার পরিবারে একদম কোনও দোষ থাকবে না সে কথা প্রজারা বিশ্বাস করত না। রায়বংশের দোষ একটাই। নারী সম্ভোগ। হেরম্ব রায় ছিলেন এই ব্যাপারে রুচিশীল। তিনি নায়েবের কাঁধে একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কুঞ্জবনে যাতে নিয়মিত নারী শরীর উপস্থিত থাকে, সেটা নায়েবই দায়িত্ব নেবেন। সেই থেকে বর্তমান নায়েব তারিণী মুখুজ্জে পর্যন্ত ট্রাডিশন চলছে। জমিদার বাড়ির পেছন দিকে বিরাট বাগান। প্রায় একশ বিঘে। বাগানের শেষ প্রান্তে একটি চমৎকার কুটির। সেটাই কুঞ্জবনের কুঞ্জকুটির। নদীতে নৌকো ভিড়িয়ে সহজেই সেখানে পৌঁছন যায়। তারিণী মুখুজ্জে নিজে পরনারীর চিন্তা পর্যন্ত করতে ভয় পান। তিনি সাত্বিক বামুন। তবে মণিবের জন্য নারী সংগ্রহে তিনি চেষ্টার কসুর করেন নি। কলকাতায় তাঁর যোগাযোগ আছে। লাইনে নতুন কোনও মেয়ে এলে তাঁকে কুঞ্জবনে নিয়ে আসার মত নেটওয়ার্ক বানিয়ে ফেলেছিলেন।

গ্রামের সবাই কুঞ্জবনের কথা জানে। অনন্তবিহারীর স্ত্রী শশিবালাও জানেন। তিনি বিষয়টা কী ভাবে নিয়েছেন সেটা বলা কঠিন, কিন্তু মেনে নিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন গগনবিহারী সেদিকে যাবে না। কিন্তু রমণী শরীর তাঁকেও চুম্বকের মত টানে। শশিবালা নায়েবকে বলে দিয়েছিলেন গগনবিহারীর ব্যাপারে। বলেছিলেন, কুঞ্জবনের ব্যাপারে গগনকে যেন কোনও রকম প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। তারিণী মুখুজ্জে অভিজ্ঞ নায়েব। কুঞ্জকুটিরে মেয়ে এনে তাঁর বাড়তি আয় হয়। নারী পছন্দ হলে অনন্তবিহারী কোনও কার্পণ্য করেন না। কার্পণ্য যে গগনও করবে না সেটাই স্বাভাবিক। কুঞ্জকুটিরে বাপের অজান্তে কোনও মেয়েকে যদি তারিণী আনতে পারেন তবে গগন বড় অঙ্কের টাকা দেবে বলে জানিয়ে রেখেছে। কাজটা তাঁর পক্ষে করা আদৌ কোনও কঠিন নয়। মেয়েটা প্রথম ক-দিন গগনকে এবং তারপর তাঁর বাপকে শান্ত করবে। সে মুখ খুলবে না, সুতরাং বাপ-ছেলের সাধ্যি নেই টের পায়।

আসলে বাপ-ছেলে কেউই এক মেয়েকে ভোগ করতে চায় না। সম্ভবতঃ এতে তাঁদের অস্বস্তি হয়।

রেজিনাকে দেখার পর তারিণীর মনে হয়েছিল যে গগনকে খুশি করার মত একজনকে পেয়েছে। তবে তাঁকে প্রথম দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন তিনি। রেজিনাকে তিনি চিনতেন। রেজিনা মুসলিম ঘরের মেয়ে নয়, কুলীন বামুনের মেয়ে। তাঁর নাম ছিল চারুকেশী। জমিদার বাড়ি থেকে রেলস্টেশন প্রায় পনের মাইল পথ। নদীপথে অনেকটা গিয়ে তারপর গরুর গাড়ি। রেল কোম্পানি স্টেশনের পাশাপাশি একটা স্কুল খুলেছিল। ফলে জনহীন একটা স্থান পরিণত হয় ছোটখাটো একটা নতুন গ্রামে। সেই নতুন গ্রামে বামুন ছিল না গোড়ায়। তারপর স্টেশনের দায়িত্ব নিয়ে সদানন্দ মুখোটি এলেন। বামুনের অভাব পূর্ণ হল। সদানন্দের সাত মেয়ে। তিনটের বিয়ে দিয়েছেন। চারুকেশী ছিল ছোট। অবিবাহিত তিন দিদির বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর খুব একটা সুশ্রী ছিল না এবং সদানন্দের আর পয়সা ছিল না। এই অবস্থায় কুলীন পাত্রের অভাবে কুলীন মেয়ের গরীব বাবারা যা করতেন সদানন্দও তাই করলেন। তিন মেয়েকে আত্মহত্যার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা তাই-ই করেছিল।

এ নিয়ে সমাজে কোনও কথা হয় নি কিছু গুজগুজ-ফিসফিস ছাড়া।

চারুকেশীর পাত্র পাওয়া গেল। তাঁর বয়স তখন এগার এবং পাত্রের বয়স পঞ্চাশ। তিনি বিয়ের পর চারুকেশীকে বাপের বাড়ি রেখে চলে গেলেন সময় মত আসবেন বলে। তারপর চারুকেশী রজস্বলা হল। তাঁর শরীরে রূপের বন্যা বইল। চারুকেশী সুন্দরী ছিল। এবার হয়ে উঠল মোহময়ী। তাঁর বুড়ো বর তাঁকে দেখে মুগ্ধ হতেন, গয়না দিয়ে ভরিয়ে দিতেন— কিন্তু তিনি সে সব না করে চলে গেলেন স্বর্গে। উপচে পড়া যৌবন নিয়ে বিধবা হল চারুকেশী।

বিধবা হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর সদানন্দের বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। কিন্তু চারুকেশীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আসলে চারুকেশী পালিয়ে গিয়েছিল খবরটা পেয়েই। তাঁর কোনও কান্না পায় নি। সে সোজা নদীর পাড়ে এসে আনিসুরকে বলেছিল, ‘আমায় বিয়ে করবি?’

আনিসুর ছিল একা। সে ছিল রেলের মিস্ত্রি। বাইশ

বছরের আনিসুরের প্রথম বউ বিয়ের চারমাসের মাথায় সাপের কামড়ে মারা যায়। বিয়ের কথা সে ভাবে নি তারপর। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের আলোয় নদীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অপরূপাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এইভাবে চারুকেশী হয়ে গেল রেজিনা।

এটা নিয়েও তেমন সরগোল হয় নি। বামুনের মেয়ের মুসলমান হওয়ার সংবাদ নিয়ে কিছু গুজগুজ-ফিসফিস হল কেবল। সদানন্দ মেয়ের মৃত্যু ঘোষণা করে শ্রাদ্ধ করলেন। আনিসুরের রমণীভাগ্য নিয়ে কিছু যুবকের হিংসে হল। এইভাবে বছর দুয়েক পর হঠাৎ করে কী জানি একটা জ্বরে ভুগে মরে গেল আনিসুর। রেজিনা তখনও গর্ভবতী হয় নি। এমনটা হওয়ার কথা নয়। সে হেকিমের ওষুধ খেতে শুরু করেছিল কেবল। সন্তান না থাকায় তাঁর পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। রেলের হেড মিস্ত্রি আহমেদ তো ধরেই নিয়েছিল রেজিনাকে সে-ই পাবে। তাঁর খরচ করার ক্ষমতা ছিল বেশি। কিন্তু রেজিনা আবার পালিয়ে গেল।

তারিণী মুখুজ্জে এ সব খবর জানতেন। রেলের গ্রামটা তাঁর মনিবের জমিদারির বাইরে হলেও সেখানকার খবর রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল জমিদারির পক্ষে। রেজিনার পালিয়ে যাওয়ার খবর শোনার পক্ষকাল পর একদিন খবর পেলেন কুঞ্জকুটিরে একটি মেয়ে এসে উঠেছে। মুসলিম। বোরখা পরা। কুঞ্জকুটিরে কোনও মেয়ে সেধে এসেছে মানে সে সব জেনে শুনেই এসেছে। কিন্তু বোরখা পরা মুসলিম শুনে তারিণী প্রথমে ভেবেছিলেন কলকাতা থেকে কেউ ঠিকানা নিয়ে এসেছে অনন্তবিহারীর শয্যাসঙ্গী হবে বলে। রেজিনাকে দেখে তাঁর বিস্ময় বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

'আমার টাকা চাই। কলকাতা চলে যাব। টাকার জন্য এসেছি।' স্পষ্ট করে বলেছিল রেজিনা। কুঞ্জকুটিরে মেয়েরা একবার এলে বেশ কয়েকদিন থেকে যেত। অনন্তবিহারীর পছন্দ হলে দু-তিন মাস। তারিণীর মনে হয়েছিল রেজিনা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে আবার আগুন হয়ে উঠবে। অনন্তবিহারীর সম্ভোগে আসা নারীদের মধ্যে রেজিনা হবে সব চাইতে আলাদা।

তারপরেই গগনের কথা মনে হয়েছিল তারিণীর।

অনন্তবিহারী একটু কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন। কুঞ্জকুটিরে কোমর-ই সব। ফলে কিছুদিন সেদিকে আর মন দিলেন না। গরমের ছুটিতে ছেলেকে বিনা নোটিশে হঠাৎ ফিরতে দেখে খুশিই হলেন। ছেলের আসার কারণ তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না। দু-দিন পর গরমের অবসান ঘটিয়ে তুমুল বৃষ্টি নামল সকালের দিকে। সন্ধের মুখে সেটা কমে আসল যখন তখন বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। কলকাতা থেকে আনা মদের বোতল, সিগারেটের টিন নিয়ে গগনবিহারী তাঁর ঘোড়ায় চেপে ঢুকলেন বাগানে। গাছপালার ফাঁকে সরু পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে কুটির অবধি। দ্বিতীয় একটি ঘোড়ায় তারিণী চলছিলেন ছোট লণ্ঠন হাতে।

আহার-বিশ্রামের কারণে রেজিনা তাঁর সতেজতা ফিরে পেয়েছিল। সুক্ষ্ম সাদা কাপড় শরীরে জড়িয়ে সে দরজা খুলে দিয়ে নতমস্তকে আমন্ত্রণ জানাল গগনকে। গগনের মুখে কথা সরছিল না। একটি জ্বলন্ত কামপ্রতিমা প্রদীপের হলুদ আলোয় স্বচ্ছপ্রায় বস্ত্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে নতচক্ষে। দেখতে দেখতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন।

'তুমি কে?' নিজেকে ঠিক রাখার জন্য কৌটো খুলে সিগারেট ধরাল গগন। ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল আধা অন্ধকার ঘরটিতে। রেজিনা এগিয়ে এসে গগনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আমি তোমার দাসী। দাসীকে কত দেবে?'

'কত চাও?' সিগারেট ফেলে দিয়ে রেজিনার কাঁধ থেকে মাকড়শার জালের মত আঁচলটা ফেলে দিল গগন। নগ্ন বুক দুটোয় এসে পড়ল ছায়ামাখা আলো। এক হাতে গগনের গলা জড়িয়ে ধরল রেজিনা। দ্বিতীয় হাত রাখল ধুতির কোচায়। ফিসফিস করে বলল, 'আমার অনেক দাম।'

গগন এতদিন শুনেছিল কামকলানিপুণা নারীদের কথা। কিন্তু কামকলা কী এবং নারী তাঁর শরীর দিয়ে সেই কলা কী ভাবে প্রদর্শন করে, সে ব্যাপারে এই প্রথম তাঁর অভিজ্ঞতা হল। রেজিনা তাঁকে ভাসিয়ে দিল। কুঞ্জকুটিরে এর আগে দু-একবার নারী সম্ভোগ করেছিল গগন। কিন্তু রেজিনা তাঁকে বুঝিয়ে দিল

শরীরের প্রকৃত স্বাদ। তাঁর উত্তাপে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল গগনের পৌরুষ। কুঞ্জকুটিরের শয্যা তাঁর কাছে হয়ে উঠছিল স্বর্গ।

পরপর কয়েক রাত গগনকে শ্রান্ত-ক্লান্ত-তৃপ্ত করল রেজিনা। তারপর কী করে জানি অনন্তবিহারী জেনে গেলেন কুঞ্জকুটিরে একটি নতুন মেয়ে এসেছে। নায়েবকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তারিণী শান্ত গলায় জানালেন, সদ্য এসেছে। কোমরের ব্যথার কারণে মনিব বিশেষ নড়াচড়া করতে পারছেন না জেনে অপেক্ষা করছিলেন। তা ছাড়া গগন এখন বাড়িতে। সে যাতে না টের পায় সে কথাও ভাবতে হয়েছে।

অনন্তবিহারী পত্রপাঠ ছেলেকে হুকুম দিলেন কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য। গগন অতটা লায়েক ছিল না যে বাপকে অগ্রাহ্য করবে। সে গজগজ করতে করতে ফিরে গেল। তারিণী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে রেজিনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। ছেলে ফিরে যাওয়ার পর অনন্তবিহারী গেলেন কুঞ্জকুটিরে। রেজিনার শরীর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যৌবনের দিনে। প্রায় একমাস পর যখন শ্রাবণের ধারায় জনজীবন থমকে গেছে তখন এক বর্ষণমুখর রাতে উদ্দাম রমণের পর ঘর্মাক্ত রেজিনা জানাল সে গর্ভবতী।

অনন্তবিহারী সুখি হলেন। এর কারণ ছিল। গগন তাঁর নিজের সন্তান নয়। শশিবালার বোনের সন্তান। শশিবালা গর্ভে সন্তান আসছিল না। অনন্তবিহারী জানতেন এর কারণ সম্ভবত তিনি। তাঁর ধাতু দুর্বল। শশিবালার বোন তৃতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর শশিবালা বাপের বাড়ি যান। সেখানেই কথাবার্তা হয়। বোনের ছেলে জন্মালে তাঁকে নিয়ে ফেরৎ আসেন শশিবালা। অনন্তবিহারীর বীর্য ধারণ করে আজ অবধি কুঞ্জকুটিরে কেউ গর্ভবতী হয় নি। রেজিনার ঘোষণায় তিনি তৃপ্তবোধ করলেন।

'তুই থাক এখানে। বাচ্চা জন্মাক। এখানেই থেকে যা রেজিনা।' বলেছিলেন অনন্তবিহারী। রেজিনা কেবল বলেছিল, সে ওষুধ জানে। গর্ভটা খসিয়ে দেবে। সে বাচ্চা চায় না। টাকা চায়। অনন্তবিহারী রাজি হচ্ছিলেন না। রেজিনার সন্তানকে সে দত্তক নেওয়ার কথা ভাবছিল। রেজিনা তখন বলেছিল, চলে যাবে।

রেজিনা চলে যেতেই চাইছিল। সে জানত সন্তান আসলে গগনের। তাঁর হাতে তখন বেশ কিছু টাকা এসেছে। গগন তাঁকে অনেক দিয়ে গেছে। অনন্তবিহারীও কম দেন নি। সে চাইছিল পেটের সন্তানকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে কলকাতায় চলে যেতে। স্বামী-সন্তান-সংসার তাঁর জন্য নয়। ভগবান বলুক বা আল্লা— সকলেই তাঁকে তৈরি করেছে বেশ্যা হওয়ার জন্য। এটাই তাঁর ভাগ্য। কিন্তু সেটা মানতে চাইছিলেন না অনন্তবিহারী। ফলে রেজিনা বাধ্য হল সত্যিটা বলতে। অনন্তবিহারী গুম হয়ে গেলেন সব শুনে। নীরবে কুঞ্জকুটির ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শেষরাতে।

গগন এতদিন শুনেছিল কামকলানিপুণা নারীদের কথা। কিন্তু কামকলা কী এবং নারী তাঁর শরীর দিয়ে সেই কলা কী ভাবে প্রদর্শন করে, সে ব্যাপারে এই প্রথম তাঁর অভিজ্ঞতা হল। রেজিনা তাঁকে ভাসিয়ে দিল। কুঞ্জকুটিরে এর আগে দু-একবার নারী সম্ভোগ করেছিল গগন। কিন্তু রেজিনা তাঁকে বুঝিয়ে দিল শরীরের প্রকৃত স্বাদ। তাঁর উত্তাপে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল গগনের পৌরুষ।

পরদিন-ই পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিল রেজিনা। কিন্তু সকাল হওয়ার একটু পরেই নীরবে আবার ফিরে এলেন অনন্তবিহারী। হাতে বন্দুক। রেজিনা ভেবেছিল শিকারের কথা।

প্রথম গুলিতেই রেজিনার বুক ফুটো হয়ে যায়। প্রবল আক্রোশে দ্বিতীয় গুলিটা অনন্তবিহারী ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রেজিনার পেটে। বোধহয় ভ্রূণটাকে গুলিবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। লাশ সেদিন রাতেই নৌকো করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেক দূরে।

পরের বছর পুজোর ঠিক আগে গগন ফিরল

কলকাতা থেকে। রেজিনা তখন অতীত। কলকাতায় এক অভিনেত্রী তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাড়িতে পুজো না হলে সে ফিরত না। গতবার পুজোর সময় যখন ফিরেছিল তখনও রেজিনাকে মনে রেখেছিল সে। সে জানত রেজিনা হঠাৎ করে চলে গেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন জানল কুঞ্জকুটির ভেঙে দিয়ে অনন্তবিহারী সেখানে মন্দির বানাবার পরিকল্পনা করেছে তখন সে বাপের প্রতি একটু সমর্থন জানিয়েছিল। কুটির তারপর ভাঙা হয়েছে, কিন্তু মন্দির এখনও হয় নি। অনন্তবিহারীর নারীসম্ভোগ অবশ্য দূর হয় নি। তিনি দু-মাসে কিছুদিনের জন্য জেলা শহরে যান। সেখানে স্বাস্থ্যবতী হিন্দুস্থানী মেয়ে পাওয়া যায়।

ট্রেন বিকেলে আসবে। তারপর মালপত্র নিয়ে গগন ফিরবে গরুর গাড়ি আর নৌকো চেপে। অনন্তবিহারী নায়েবকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন স্ট্যান্ডফোর্ড সাহেবের কুঠির উদ্দেশ্যে। সাহেবকে পুজোর নেমন্তন্ন করাই ছিল উদ্দেশ্য। শরতের দুপুরে দু-জন ঘোড়ায় চড়ে টুকটুক করে যাচ্ছিলেন একটা মাঠ ধরে। মাঠের শেষে গাছপালায় ঘেরা একটা পুরোন বাড়ি। একদা এটা ছিল পান্থশালা। এখন পরিত্যক্ত। সাধু-ভবঘুরেরা মাঝে মধ্যে এসে থাকে। অনন্তবিহারী ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে একবার তাকালেন বাড়িটার দিকে। একটা লোক বেরিয়ে এসে তাঁকে হাতছানি দিয়ে দাঁড়াতে বলল।

একটু অবাক হয়ে লাগাম টানলেন অনন্তবিহারী। লোকটাকে দেখেছে তারিণীও। তাঁর ভুরু দুটো ভীষণ কুঁচকে গেছে। কাঁধে ঝোলান রাইফেলের বাঁটে হাত রেখেছেন তিনি। লোকটা এগিয়ে আসছে। অনন্তবিহারী চেনেন না তাঁকে। তিনি তাকালেন নায়েবের দিকে।

'তুই আনিসুর না?' নায়েবের গলার সুরে স্পষ্ট বিস্ময়। 'তুই মরিস নি?'

ক্লান্ত হাসল আনিসুর। তারিণী সতর্ক চোখে একবার তাঁকে দেখে নিয়ে মনিবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'রেজিনার স্বামী। আমি তো শুনেছিলাম মরে গেছে।'

'তাই-ই তো বলেছিলে!' বিরক্ত গলায় কথাটা বলে আনিসুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চাস?'

'রেজিনাকে মারলেন কেন? ওর পেটে আমার বাচ্চা ছিল!'

'তোর?'

'আপনার ধাতু দুর্বল। আল্লার এমন খেলা— আপনার ছেলেরও তাই। ওই বাচ্চা আমারই ছিল। রেজিনা আমার আগুনে বউ কত্তা! ওর সাথে আমি সব লোকেই মিলন করি।'

অনন্তবিহারী চারদিকে একবার নজর দিলেন। ধু ধু ফাঁকা। আনিসুর তাঁরই জমিদারি এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চোখ দিয়ে তারিণীকে একবার ইশারা করলেন। কাঁধ থেকে রাইফেল নামি আনিসুরকে গুলি করলেন নায়েব। আনিসুর একটু কেঁপে উঠল। যেন বাতাসের ধাক্কায় একটু নড়ে উঠল কোনও কাগজের তৈরি আনিসুর। গুলি তাঁকে মধ্যে দিয়ে চলে গেল বিনা রক্তপাতে। আনিসুর ম্লান হেসে বলল, 'আমি আগেই মারা গেছি কত্তা! নৈলে রেজিনাকে ভোগ করতেন কী ভাবে?'

ঘোড়া দুটো অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভয়ে শিউড়ে উঠল। ভয়ার্ত চিৎকার লাফিয়ে উঠল চকিতে। তারপর উন্মত্তের মত ছুটতে লাগল পথ বেয়ে। সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটছিল ঘোড়াদুটো। তাঁদের পিঠে সওয়ার থাকা হয়ে উঠল অসম্ভব।

পরের বছর জমিদারি বিক্রি করে মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল গগনবিহারী রায়। একই সাথে ঘোড়া থেকে পড়ে জমিদার এবং নায়েবের মৃত্যু রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল সমাজে। কিন্তু রেলগ্রামে আলোচনার বিষয় হল একদম আলাদা। সেখানে কোনও কোনও চন্দ্রালোকিত রাতে রেল লাইন ধরে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছিল আনিসুর-রেজিনাকে। অন্তত চার-পাঁচজন দেখেছে সে দৃশ্য। সুখি দম্পতির মত তাঁরা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যায়। তাঁরা কাউকে ভয় দেখায় না। আনিসুর যে মরে গেছে সে কথা তো সকলেই জানে, কিন্তু রেজিনা মরল কবে? সে কি আত্মহত্যা করেছিল? রেলের সিগন্যাল ম্যান দহিপ্রকাশ জোর দিয়ে বলেছে যে কেবল আনিসুর-রেজিনা নয়, সে স্পষ্ট দেখেছে রেজিনার কোলে একটা বাচ্চা।

ভূতের বাচ্চা?

গল্প

গেছো

ছন্দা বিশ্বাস

একটা ডাব হাতে করে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। ধারালো দা দিয়ে বেশ বড়ো সাইজের ডাবটার দুইমুখ কাটা। সামনের দিকটা ফুটো করে টুকরো অংশটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সে। ঘরের বাইরে লাইনে তখনো প্রায় দুশো পেশেন্ট। তাদের ভিতরে অনেকে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মেঝেতেই বসে পড়েছে। সেই কোন ভোর বেলা দূর দূর থেকে এসে লাইন দিয়েছে গর্ভবতী মহিলারা। আলপথ ধরে মাইল খানেক পথ হেঁটে তবে পাকা সড়ক, তারপর ভিড় বাসে গাদাগাদি চাপাচাপি করে নয়তো ভ্যানে চেপে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে তবে মহকুমা হাসপাতালে বড় ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আসতে হয় তাদের। পোয়াতি শরীরে এতটা ধকল সইবে কেমন করে।

শুক্রবার ডাঃ ঘোষের আউটডোর শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধে হয়ে যায়। পি পি ইউনিট ছাড়া আর বাকি সব আউটডোর দুটো আড়াইটের ভিতরে শেষ হয়ে যায়। পি পি ইউনিটের সিস্টার কিম্বা আয়া মাসিদের এখানে ডিউটি পড়লে তাই মহা জ্বালা হয়। সেদিন স্কিনের রেবা সিস্টার পি পি ইউনিটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঠোঁটে ঝোলা হাসি নিয়ে একবার উঁকি মারেন। তখন প্রতিভাদি ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ব্যাজার মুখে বলেন, লাইন তো নয়, যেন পাইথন পড়ে আছে। আজ সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

সত্যি কিচ্ছু করার নেই। দিন দিন পেশেন্টের চাপ বাড়ছে। পি পি ইউনিটের দুইজন ডাক্তারের ভিতরে একজন আবার ছুটিতে, তিনজন সিস্টার, আয়া মাসিরা নাজেহাল হয়ে যান পেশেন্ট সামাল দিতে। আউটডোরে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো কাছাকাছি যদি রোগী দেখতে হয় কার মাথা ঠিক থাকে? তার উপরে গর্ভবতী রোগী দেখা তো আরও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেদিন আবার সেকেন্ড মেডিকেল অফিসারটি অনুপস্থিত ছিলেন। ডাঃ ঘোষ একাই সামাল দিচ্ছেন।

জৈষ্ঠ্যের কাঠফাটা দুপুরে আগুনের হলকা ছুটছে। গরমে সকলে হাঁসফাস করছে। মাথার উপরে মান্ধাতার আমলের উষা ফ্যানটি খটাং খটাং শব্দে তার বার্ধক্য জানান দিচ্ছে। যত শব্দ তার সিকি ভাগ যদি হাওয়া দিত, গজ গজ করছেন সিস্টার। এমন সময়ে ডাব হাতে লোকটিকে দেখে কাঁইমাই করে ওঠে সিস্টার দুইজন, "এই, শোনো, শোনো, কোথায় যাচ্ছ?"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। চারফুট আট ইঞ্চির বেঁটে খাটো হৃষ্টপুষ্ট শরীর বছর পঞ্চান্নের মানুষটা হাত উঁচুতে তুলে ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে যেখানে ডক্টর ঘোষ আছেন সেই দিকে। ডাঃ ঘোষ তখন পাশের ঘরে পেশেন্ট এগজামিন করছিলেন। পাশের আর একটি টেবিলের উপরে আয়া মাসি অন্য একজন মহিলাকে একেবারে সায়ার দড়ি ঢিলে করে নাভি থেকে কিছুটা নীচের দিকে নামিয়ে পেটের কাপড় সরিয়ে রেডি করে শুইয়ে রেখেছেন যাতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না হয়। শেফালী সিস্টার রোগিণির পালস, বি পি চেক আপ করছেন। ওয়েট দেখছেন তারপর সেগুলি খাতায় নোট করছেন। ডাক্তারবাবু এসে রোগিনীর পেটে হাত রেখে ফান্ডাল হাইটস দেখবেন, বাচ্চার গ্রোথ ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য করবেন স্টেথোস্কোপ বসিয়ে ফিটাল হার্ট সাউন্ড শুনবেন, তারপর পেশেন্টের মুখ থেকে বাকি কথা শুনে দ্রুত হাতে প্রেস্ক্রিপশান করবেন।

এর ভিতরে লোকটা একেবারে সটান ডাঃ ঘোষের

টেবিলের সামনে এসে ডাবটা রাখতেই ডাঃ ঘোষ শুধু অবাকই হলেন না সেই সাথে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। এমনিতেই সেই সকাল নটা থেকে পেশেন্ট দেখতে দেখতে তিনি হাঁফিয়ে উঠেছেন তার ভিতরে এই লোকটিকে এখানে দেখে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, “কী ব্যাপার? তুমি ঢুকেছ কেন এখানে? দেখছ না এখানে গাইনি পেশেন্ট চেক আপ করা হচ্ছে?”

তারপর মাসিদের উদ্দেশ করে জোর ধমক দিলেন।

মাসিরা তো তো করতে করতে বলেন, “কী করব স্যার, আমাদের কথা তো শুনলই না। বলছে আপনাকে ডাব খাওয়াতে এসেছে।’

ডাঃ ঘোষের মাথাটা এমনিতেই গরম ছিল তার উপরে এখানে লোকটিকে দেখে তিনি আরও রেগে গেলেন। টেবিলের উপর থেকে ডাবটাকে ইঙ্গিত করে রাগত স্বরে বললেন, “কেন এনেছ এসব? কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? যাও, এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও?”

লোকটার উজ্জ্বল মুখটা মুহূর্তে ভিতরে রক্তশূন্য নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ডাবটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে ডাক্তারবাবুর দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাতে তাকাতে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছু সময় পরে পেশেন্টের চাপ কমে এলে ডাঃ ঘোষ এক কাপ চা খেতে খেতে প্রতিভা সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সিস্টার, লোকটা কে বলুন তো?”

“আর বলবেন না স্যার, লোকটা আমাদের হাসপাতালের গেটের মুখে ডাব বিক্রি করে। অবসর সময়ে লোকের বাড়িতে গিয়ে নারকেল গাছ ঝুরে দেয়। সবাই ওকে ‘গেছো’ বলে ডাকে। খুব সরল হাবাগোবা গোছের মানুষ। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের যার যেদিন আউটডোর চলে সেদিন তাদেরকে ডাব খাওয়ায়। এমনিতে মানুষটা খারাপ না।”

ডাঃ ঘোষ এই হাসপাতালে নতুন, তাই গেছোকে চিনতে পারেন নি। পরে জেনেছেন এই হাসপাতালে সবাই ওকে চেনে এবং খুব ভালবাসে।

২

“নারকেল গাছ ঝোরাবেন গো?”

আমলা পাড়া, পেয়াদা পাড়ার রাস্তা দিয়ে বিচিত্র সুরে হাঁক দেয় গেছো। তার এই সুর সকলের চেনা। দূর বহুদূর থেকে শোনা যায় তার এই হাঁক ডাক। বর্ষাকালটা বাদ দিলে সারাটা বছর এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে ঘুরে সে সকলের বাড়ির নারকেল গাছ ঝোরে আর ডাব নারকেল বেচে সংসার চালায়। বিয়ে থা করে নি, নিজের বলতে গাঁয়ের দিকে থাকে এক ভাইপো আর তার বৌ। বছরে এক আধবার বাড়ির দিকে যায়।

কোমরে লুঙ্গিটাকে নেংটির মত করে পরে নিয়ে ধারালো দা-টাকে পিছনে গুঁজে সরীসৃপের মত সরু লম্বা দেড়শো দুশো বছরের প্রাচীন নারকেল গাছগুলোতে তরতর করে উঠে যায়। নীচ থেকে তখন ওকে দেখায় শাখামৃগের মত। উপরে উঠে একটা মোটা দড়ি দিয়ে নিজেকে গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে নেয়। তারপর পিছনে গোঁজা দা টাকে বের করে গাছের শুকনো পাতাগুলোকে কেটে নীচেয় ফেলে। গাছের বুক থেকে আগাছা পরিষ্কার করে। ওষুধ স্প্রে করে সময়ে যাতে ফলন ভাল হয়। কুষি কুষি ডাবগুলো যাতে ঝরে না পড়ে যায় তার জন্যে কত না কসরৎ করে গেছো। কপার অক্সাইড জলে গুলে গাছের পাতায় স্প্রে করে। নারকলের শাঁস যাতে পুরুষ্ট হয়, গাছের ফলন ভাল হয়, ডাব অবস্থায় যেন নষ্ট হয়ে খসে না পড়ে, সব ওষুধ গেছোর জানা আছে। মুচি যাতে না ঝরে তার জন্যে অক্সি ক্লোরাইড, পোকামাকড়ের জন্যে ফেনপাইরক্সিমেট ৫ জলে গুলে স্প্রে করে। গাছের বাড়ন্তের জন্যে বছরে দুইবার করে গাছের গোড়ায় গোবর সার, ইউরিয়া কিম্বা সুপার ফসফেট দিয়ে মাটি চাপা দেয়।

সেদিন ভবেন বৈদ্যের বাড়ির নারকেল গাছে সদ্য মুচি থেকে বের হওয়া কচি কচি ডাবগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, তোগেরে তো আমি কতো সেবা করি, আগাছা সাফ করি, জঞ্জাল সরাই, ওষুধ দেই কতো, যাতে ভাল মতন রোদ জল পাস, গায়ে গতরে বড়ো হোস, আর আমারে সেদিন ডাক্তারবাবু মুখ্যসুখ্যু মানুষ ভেবে কত অপমানটাই না করলে।

উনি না হয় মানুষের ডাক্তার। পেটে বাচ্চা আলি পর কী ওষুধ খাতি হবে কি করতি হবে সব বলে দ্যান, ওই ত খানকতক ভিটামিন ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম বড়ি আর আয়রন ট্যাবলেট হাতে ধরিয়ে দ্যান। কিন্তু নারকেল গাছের ফলন কীসে বাড়বে, ডাব পুরুষ্টু হবার আগেই যাতে না পড়ে যায়, ফুলে কোনও সময় য্যান পোকামাকড় না লাগে, হে সব জানে ওই ছোকরা ডাক্তার? কী ওষুধ স্প্রে করতি হয় তার নামধাম জানা আছে?"

৩

কিছুদিনের ভিতরেই গেছোর সাথে ভালরকম সদ্ভাব হয় গেছে ডাঃ ঘোষের। ডাঃ ঘোষই একদিন কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে বিকেলের দিকে গেছোর কাছ থেকে ডাব খেতে খেতে সেদিন ওইভাবে ঢুকে পড়ায় তিনি রেগে গিয়েছিলেন বলায় গেছো তো লজ্জায় মুখ কোথায় লুকাবে ভেবে পায় না। বলে, "মাপ করি দেবেন, বাবুমশায়। মুক্কুসুক্কু মানুষ, আমি কি ছাই অতোশতো বুজি? বেবাক গরমে ডাবের জল খালি পরে শরীল মন তাজা থাকে তাই।"

ভিড় ঠেলে ডাক্তারবাবুদের ডাবের জল খাওয়ানোয় গেছোর ভিতরে আত্মসন্তুষ্টি ছাড়াও এক ধরনের গরিমা প্রকাশ পায়। কখনোসখনো ডাক্তারবাবুদের প্রচ্ছন্ন আস্কারা পেয়ে টেবিলের উপর থেকে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দেওয়া দুই একটা ভিটামিন টনিক তুলে নিয়ে ট্যাকে গোঁজে। ওদের গ্রাম থেকে পেশেন্ট এসেছে দেখতে পেলে লাইন টপকে আগেভাগে ডাক্তারবাবুদের দেখিয়ে নেয়। ভাবখানা এমন করে, ও যেখানে আছে সেকেনে আবার লাইন দিতি হবি কেনে? তারপর আবার নিজের জায়গায় গিয়ে হাঁক পাড়ে, ভাল ডাব আছে গো, শরীল ঠান্ডা রাখবে, প্যাট ভাল থাকবে, কিটনী ভাল থাকবে, ডাইরিয়ার এক নম্বর দাওয়াই আছে গো।

গরমের সময়ে গেছোর ভালই বেচাকেনা চলে। ও সময়ে অসময়ে হাসপাতালে আসা অসহায় গরীবগুর্বো মানুষগুলোকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

৪

দেখতে দেখতে এই হাসপাতালে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ডাঃ ঘোষ আজকাল আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেই থেকে প্রত্যেক আউটডোরে গেছো একটা বড় সাইজের ডাব এনে আস্তে করে ডাকে, 'বাবুমশায়'

ডাঃ ঘোষ এতোদিনে গেছোর সরলতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখে গেছেন। তিনি আর বকাঝকা না করে বাইরের ঘরে এসে ডাব খেয়ে যান। কখনও মাসিদের বলে পাঠান রেখে যেতে, পরে খেয়ে নেবেন।

ডাঃ ঘোষ সেদিন কথায় কথায় একজন স্টাফের মুখ থেকে জানতে পারলেন গেছো নাকি খুব অসুস্থ। ওর প্রেশার বেড়ে গিয়ে একেবারে মাথা ঘুরে সেদিন পড়ে যায়। সকলে ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। ডাঃ মিত্রর অন কল ছিল। উনিই গেছোকে দেখছিলেন। ইনভেস্টিগেশান করে জানা গেল ওর ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন খুব হাই। অনেকদিন ধরেই প্রেশার সুগার হাই ছিল, কিন্তু ও কিছুতেই ওষুধপত্তর খেত না, প্রেশার মাপতো না।

গেছো ডাঃ ঘোষের কোয়ার্টারে গিয়ে মাঝে মাঝে মিসেসের কাছে ডাব দিয়ে যায়। বাছাই করা ডাব। মেঘমা পয়সা দিতে গেলে পরিষ্কার করে বলে, "এখন লাকপে না, সব হিসেব করে রাখে দিচ্চি, তোমার খোকার কাছ থে সব আদায় করে নোবো।"

মেঘমা একবুক শ্বাস ছাড়ে, কোথায় খোকা! বুকের ভিতরে ইচ্ছা হয়েই কি কাটিয়ে দেবে সারাটা জীবন? কোনওদিন কি তার মুখ দেখতে পারবে না? কলকাতায় গিয়ে এতো নামী সব ডাক্তার দেখাচ্ছে, যা বলছেন সেই মত চলছে।

তারপর মনে মনে বলে, তোমার কথাই যেন সত্যি হয় গেছোদাদা, সব পয়সা উশুল করে নিও আমার খোকাবাবুর কাছ থেকে।

৫

এইভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। গেছোর এখন অনেকটা বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মত উঁচু গাছে উঠতে পারে না। ছোটোখাটো বয়সের নবীন গাছ যা আছে তাই ঝুরে কোনওমতে সংসার চালায়।

বেশ কিছুদিন হল গেছোকে আর দেখা যাচ্ছে না। মেঘমার শরীরটাও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। একজন নামকরা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ একেবারে কমপ্লিট বেড রেস্টে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ পথ্য খাওয়া থেকে শুরু করে যেদিন চেক আপ করার কথা সেইভাবে করছে। মেঘমা কন্সিভ করার পর থেকে ডাঃ ঘোষ আজকাল অনেকটা সময় বাড়িতেই কাটান।

ডাঃ ঘোষ সেদিন কথায় কথায় একজন স্টাফের মুখ থেকে জানতে পারলেন গেছো নাকি খুব অসুস্থ। ওর প্রেশার বেড়ে গিয়ে একেবারে মাথা ঘুরে সেদিন পড়ে যায়। সকলে ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। ডাঃ মিত্রর অন কল ছিল। উনিই গেছোকে দেখছিলেন। ইনভেস্টিগেশান করে জানা গেল ওর ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন খুব হাই। অনেকদিন ধরেই প্রেশার সুগার হাই ছিল, কিন্তু ও কিছুতেই ওষুধপত্তর খেত না, প্রেশার মাপতো না। এখানে ওর কন্ডিশান এতোটাই খারাপ হয়ে যায় যে ওকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে।

"সে কী? এতো কিছু ঘটে গেছে অথচ আমি কিছুই জানতে পারি নি?"

"কী করে জানবেন স্যার? আপনি তখন ছুটিতে ছিলেন। ক্লাবের ছেলেরা গেছোকে কলকাতায় নিয়ে গেছে। হাসপাতালের স্টাফেরা বেশ কয়েক হাজার টাকা তুলে দিয়েছে। ওর তো নিজের বলতে তেমন কেউই নেই।"

ডাঃ ঘোষ মুহূর্তের জন্যে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। ক্লাবের বেশ কিছু ছেলের সাথে ওনার ভালরকম হৃদ্যতা আছে। উনি জানেন এই সময়ে কত টাকাপয়সার দরকার। উনি তৎক্ষণাৎ ক্লাবের একটি ছেলেকে ফোন করে গেছোর সংবাদ নিলেন।

জানতে পারলেন গেছো মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে। শরীরের অবস্থা ভাল নয়। ডায়ালিসিস করতে হবে বলছে, তার ভিতরে আবার ব্লাড দিতে হবে। হিমোগ্লোব্লিন নাকি খুব কম।

ডাঃ ঘোষ জানতে পারলেন ক্লাবের ছেলেরা নাকি পালা করে গেছোকে দেখতে যায়।

তিনি ছেলেটিকে আসতে বলেন। পাশেই বাড়ি, তিনি ছেলেটার হাতে দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এটা রাখো। আগামী সপ্তাহে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, ওখানকার নেফ্রোলজিস্ট যিনি আছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত, দেখি আমি যদি ওনাকে বলে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থাটা করতে পারি।

৬

হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছিল গেছো। দেখে চেনার উপায় ছিল না। পেটটা ফুলে একেবারে ঢোলের মত হয়ে গেছে।

হাত-পাগুলো সরু লিকলিকে কাঠির মত। মুখটা ফুলে গোল ফুটবলের মত হয়ে গেছে। সিমটমগুলো একেবারে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের সাথে মিলে যাচ্ছে।

তিনি দেখলেন গেছোর সেই আদি অকৃত্রিম হাসিটা আজও অমলিন।

বেডের পাশে দাঁড়াতেই গেছো ঠিক তাঁকে চিনে ফেলেছে। শত কষ্টের ভিতরেও মুখে হাসি এনে বলছে, "আপনি এসেছেন বাবুমশায়? মা জননী ভাল আছেন?"

ডাঃ ঘোষ বুঝতে পারছেন ওর কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

উনি হাত উঁচু করে বললেন, সকলেই ভাল আছে।

গেছো পাশের বেডের একজনাকে দেখিয়ে বলছে, "দেখো, আমাদের হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, জানো আমার জন্যি উনি কতদূর থে ছুট্যে এয়েছেন, কত ট্যাহা পাঠায়ে দেছেন আমার চিকিৎসের জন্যি ডাক্তারবাবুরা। এই যে আমি এতোদিন বেঁচে আছি সব তেনাদের দয়ায়।"

ডাঃ ঘোষ আস্তে আস্তে বলেন, "আমরা কিছুই

করতে পারি নি গেছো তোমার জন্যে। তুমি যা করেছ সকলের জন্যে সে দান অমূল্য। সকলকে ভাল রাখতে গিয়ে নিজের দিকেই কখনও তাকাও নি। সকলের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেছে, সকলের কিডনি ভাল রাখার জন্যে ডাবের জল খাইয়েছ কিন্তু নিজে কোনওদিন একটা ডাব খেয়েছ? না ঠিকমত ওষুধ পথ্য খেয়েছ?"

গেছো ডাঃ ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে অমলিন একটা হাসি উপহার দেয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "আমি সব শুনিচি, কথাডা শোনার পর থে কী যে ভাল লাগদিছে।"

"কোন কথা?"

গেছো লাজুক হেসে নীচু গলায় বলে, "মা জননীর কোলে খোকা আসতিছে। বড্ড সাধ হয় বাবুমশায় খোকারে নিজির হাতে ডাব পেড়ে খাওয়াতে।"

"হ্যাঁ খাওয়াবে অবশ্যই খাওয়াবে। তুমি আগে সুস্থ হও।"

৭

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল যেন মাথার কাছে জানালার পাশে গেছো দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে, "বাবুমশায়!"

ডাঃ ঘোষ ধড়ফড় করে উঠে পড়েন। এক্ষুনি তাঁকে বেরোতে হবে। ছ'টার সময়ে মেঘমাকে সিজারিয়ান সেকশানের জন্যে ওটি-তে নেওয়া হবে। তারপর সারাটাদিন ভীষণ ব্যস্ততার ভিতরে কেটে গেল। মা এবং সন্তানকে সুস্থ দেখে ঘরের পথে পা বাড়ালেন।

ফেরার পথে হাসপাতালের গেটের সামনে একটা জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাঃ ঘোষ।

দেখলেন ফুল মালা দিয়ে ক্লাবের ছেলেরা একটা কাচের শববাহী গাড়ি 'শেষ খেয়া' সাজাচ্ছে।

ডাঃ ঘোষকে দেখে কয়েকজন এগিয়ে এল। ছেলেগুলোর কথা শুনে চমকে ওঠেন ডাঃ ঘোষ।

তাকিয়ে দেখেন কাচের ভিতরে শায়িত আছে গেছো।

সেই খেয়ায় চেপে অচিনপুরের দিকে পাড়ি দেবে গেছো।

ল্যাব ডিটেকটিভ

সাহিত্যে ডিটেকটিভদের রহস্যভেদ পড়তে ভালো লাগে। বাস্তবে অপরাধী খুঁজে বের করতে পুলিশকে পরিশ্রম করতে হয়। তদন্তে নামার পর অনেক সময় ক্লু হারিয়ে যায়। সেই ক্লু খুঁজে বের করেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এমন কিছু কেস এখানে তুলে দেওয়া হল, যেগুলির অপরাধী ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও থাকছে একাধিক ইন্টারেস্টিং কেস। আগামী এপ্রিল ২০২১ সংখ্যা থেকে শুরু হবে এই ধারাবাহিক। লিখছেন **নিখিলেশ রায়চৌধুরী**।

বেনারসের আচার

তনুশ্রী পাল

আমচরিতের এই পঞ্চম পর্বের লেখাটি সেই বয়সের ঘটনাগুলো ছুঁয়ে আসার প্রয়াস; যখন বিষাদ নামের শব্দটির সঙ্গে মোটে পরিচয় ঘটে নি। যখন ছোট্ট ছোট্ট সুখের পায়রাগুলো সারা দিনমান বুকের মধ্যে বকবকম করে। ছোটবড় সবার মধ্যে প্রীতিজাগানিয়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইচ্ছে জেগে থাকাই বুঝি জগতের নিয়ম, এমনটাই বোধ হয়। মানুষ কোনওকালেই দেবতা ছিল না ঠিকই কিন্তু ততটা দানবও ছিল না। আজ আমাদের চারপাশে ফেনিয়ে ওঠা ঘোলাটে নাগরিকতায় মানব প্রজাতির জন্যে সুসংবাদ খোঁজে মন। মানবজমিনে ঝরে পড়তে উন্মুখ পবিত্র বৃষ্টিপতনের সুরেলা ধ্বনি শুনতে চায় হৃদয়। নিজের অজান্তেই সে বেরিয়ে পড়ে। জীবনের সকালবেলার দিনগুলোকে একটু ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখতে চায়।

‘তাই তাই তাই মামাবাড়ি যাই / মামাবাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই’ হয়তো বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় ছড়াটি অনুসরণে প্রতিবছর গরমের দিনে মাসখানেকের জন্যে আমরা মামাবাড়ি যেতাম। রাসমেলা উপলক্ষেও যাওয়া হত। যৌথপরিবারের জাঁতাকল থেকে মা কিছুদিন ছুটি পেতেন। মায়ের সঙ্গে আমরা তিন ইড়িগিড়ি। কাকা বা নিকট প্রতিবেশী কেউ না কেউ পৌঁছে দিয়ে আসত। পিঠোপিঠি তিন পুঁচকে ও ব্যাগপত্তর সমেত মায়ের একার পক্ষে অতটা পথ যাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন বাস, আবার শিলবাড়িঘাট, ফের বাস, ফের রিক্সা তবে গিয়ে মামাবাড়ি। ফেরার সময় সেই একই ব্যবস্থা।

মামাতো ভাইবোন আর পাড়াসুদ্ধ কচিকাঁচারা

মিলে দিনগুলি মহানন্দে কেটে যেত! দুপুর দুপুর বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে ভেসে আসত এক জাদুকরের কণ্ঠস্বর 'চাই ভাল ভাল বেনারসের আচাআআর। আচাআআর চাই আচাআআর।' বাড়ির লোকেদের অনুনয় বিনয় করে দু'দশ পয়সা। সত্যি তখন দশ পয়সায় একচামচ আচার কাগজের ঠোঙায় ভরে হাতে দিত আধময়লা ধুতি আর গেঞ্জি পরা আচারওয়ালা। অতজন ভাইবোনের যুদ্ধ লেগে যেত ওইটুকু আচারের ভাগ নিয়ে। কাড়াকাড়ি করে কাগজসুদ্ধ চালান হয়ে যেত পেটে। তার ঠেলাগাড়ি ভর্তি বড়বড় কাচের বয়ামে কতরকমের যে আচার! কী তার সুগন্ধ! সারা রাস্তায় সেই স্বর্গীয় গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে সে চলে যেত।

একটু বড় হতেই সুযোগ পেলাম পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্পোর্টস, পিকনিক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে। মামাবাড়ির ঠিক উল্টোদিকে সবুজ চতুষ্কোণ মাঠের ধারে কাঠের পাটাতনের ওপরে টানা বারান্দাওয়ালা বাড়িটি ছিল মায়ের প্রাণেরবন্ধু ভিক্টর মাসিদের। মাসির বড় মেয়ে মামণিদিই ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে বনভোজন ইত্যাদি সবকিছুর মূল হোতা। সে তখন স্কুলের একেবারে উঁচুক্লাসের ছাত্রী। তার মধ্যে ছিল সত্যিকারের লিডারশিপ কোয়ালিটি। ওই বয়সেই সে পাড়াসুদ্ধ লোক জুটিয়ে নানা অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সম্পন্ন করে ফেলত, সবাই তাকে ভালবাসত, গুরুত্বও দিত। তো সেবারে দুদিন ধরে অনুষ্ঠান, ২৫শে বৈশাখ পালন। কেননা বড় ছোট মিলিয়ে এত শিল্পী, একদিনে কুলোয় না। যথারীতি মামণিদিদের বাড়ির সামনের মাঠে স্টেজ হল, এর তার বাড়ির চৌকি,বেঞ্চ চেয়েচিন্তে। নাচ, গান, কবিতা, নাটক সব নিয়ে জমজমাট পাড়া। পোশাকআশাক ফুলের মালা, ওড়না, পার্ট মুখস্থ, কবিতা মুখস্থ, গানের রেওয়াজ, ঝুনুঝুনু পায়েল... কী নেই।

প্রয়োজনীয় সাজপোশাক বা রিহার্সালের অভাবে বাদ না পড়ি, সেই চিন্তা! ক'দিন রিহার্সাল চলল ওদের বাড়ির বারান্দায়। আগেরবার ডাকঘর নাটকে সুধার চরিত্রে ছিলাম। ডায়ালগ শেষ হলেও মঞ্চ ত্যাগ না করায় বিস্তর বকা খেয়েছি। এবারে কোনও ভুল হলে আর চান্স হবে না জানি। তবে এবারে পূজারিনী নৃত্যনাট্যে শ্রীমতীর রোল, ডায়ালগ নেই। ভাষ্যপাঠের সঙ্গে অভিনয়। শেষ দৃশ্যে বুদ্ধের স্তূপমূলে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করবে শ্রীমতী আর রাজাদেশে জল্লাদ তাকে হত্যা করবে সেখানেই। তারপর ধীরে ধীরে যবনিকা পতন। মামণিদি পইপই করে বলে দিয়েছে যতক্ষণ না ডাকবে আমি যেন প্রণামের ভঙ্গিতেই পড়ে থাকি। মৃতমানুষ চট করে উঠে গেলে লোকে হাসবে। নৃত্যনাট্যই সেদিনের শেষ নিবেদন। নাটক শেষ, দর্শকদের চটাপট হাততালিও শুনি কিন্তু আমাকে আর কেউ ডাকে না! প্রায় ঘুমিয়েই পড়ি আর কি, তারপর কার খেয়াল হলে ডেকে উঠিয়েছিল সেসব আর মনে নেই। আজ সেসব দৃশ্য কল্পনাতেও ঠোঁটের কোণে হাসি জাগে।

পড়াশুনো, চাকরি, জীবনের আরও কত ব্যস্ততায় কখন যে মামাবাড়ি যাতায়াত কমে যেতে যেতে প্রায় বন্ধই হয়ে গেল টের পাই নি। মামা নেই, দাদু নেই, শীতের সকালে উঠোনের রোদ্দুরে বসে, সকালের জলখাবার ঘি, আলুসেদ্ধয় মাখা ভাতের দলা খাওয়া নেই। আতপ চালের ম ম করা গন্ধও হারিয়ে গেছে কবে!

জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাইষষ্ঠীর পর আমাদের বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি শুরু হত। খুব নিষ্ঠা সহকারে ষষ্ঠীপুজো হত মামাবাড়িতে; পেছনে বাচ্চাকাচ্চার দল নিয়ে দিদিমা, মা, মামীরা আরও সব প্রতিবেশিনীসমেত সেজেগুজে সাগরদিঘিতে ডুব দিতে যেতেন; আমের পল্লব, ঘট, পাখা, কুলো, ফল-টল নিয়ে। সন্তানেরা যে কত গুরুত্বপূর্ণ মা দিদিমাদের আচরণে তা উপলব্ধ হত; ওই ঘাটের-জল, পাখার হাওয়া, একটি করে ফল হাতে পেয়ে। সাগরদিঘিতে নাবার-ধোবার তখন তেমন বিধি নিষেধ ছিল না, শহরটাকে রাজার শহরই মনে হত। এমন গিজগিজে ভিড় আর এত এত ঘরবাড়িও ছিল না। এমন অপূর্ব টলটলে জলের দিঘি, চারপাশে

খানিক দূরত্ব নিয়ে রাজ আমলের বেঞ্চ, সুদৃশ বাতিস্তম্ভ। ঝকঝকে পরিষ্কার শহর, সবেতেই আভিজাত্য আর আতিথেয়তার স্পর্শ।

দিদিমার ন্যাওটা আমি মামাবাড়ির ভারি মজা ফেলে ফিরতে চাইতাম না মোটে। ভারি শান্তশিষ্ট ছোটোখাটো চেহারার দিদিমার যাত্রা দেখার আর খবরের কাগজ পড়ার নেশা ছিল খুব। আজ ভাবলে অবাক লাগে সেই শীতের রাতে গুটিগুটি পায়ে বছর আটেকের নাতনিকে নিজের গায়ের চাদরে ঢেকে দিদিমা সেই অত্তদূরে মেলার মাঠে যাত্রা দেখতে যেতেন। কত যাত্রা দেখেছি দিদিমার সঙ্গ ধরে! শীতে কাবু সব ভাইবোনেরা লেপের তলে ঢুকে পড়লেও ঠায় বসে থাকতাম উঠোনে কাঠকুটোয় জ্বালানো আগুনের ধারে। রান্নাঘরের, ঠাকুরঘরের টুকটাক কাজ আর শেষ হতে চাইত না দিদিমার। আসলে সেসব টাইমকিলিং, মানে যে যার ঘরে ঢুকে দোর দেবে তারপর শুরু আমাদের যাত্রা অভিযান। মাথায় ভেল, হাঁটুছোঁয়া ফ্রকের ওপর একটা সোয়েটার, দিদিমার কালচে রঙা চাদরের ভেতর ঢুকে সেই সুনসান রাতের বেলা যাত্রা দেখতে যাওয়া। দূর থেকে কনসার্ট শুনে চনমনে আমরা আরও জোরে হাঁটতাম। বেশিরভাগ দিনই শুরু হয়ে যেত পালা। ভোররাতে অলৌকিক কুয়াশা ভেঙে ফিরে আসা, যেন কল্পলোক থেকে হঠাৎ অন্যজগতে ফেরা! চোখে তখনও সেঁটে পালাগানের কুশীলবদের প্রতিটি ভঙ্গিমা, অস্ত্র ঝনঝনা, টানা সুরে নায়িকার গান। 'হা হা হা ভাবনা কাজী জুজুর ভয় করে না হা হা হা' নিষ্ঠুর ভিলেনের হাসিতে চারধার কেঁপে ওঠে। আঁচল লুটিয়ে কাঁদতে থাকে সোনাই নামের নায়িকা। তাকে ধরে নিয়ে যায় অতিদুষ্টু ভিলেন ভাবনা কাজী। 'সোনাইদিঘি' যাত্রাপালা দেখে নায়িকার দুঃখে মন ভার হয়ে থাকে। ভাইবোনেদের সঙ্গে যাত্রা বিষয়ক কোনও কথাই ভাগ করা চলে না, ঠোঁটের ডগায় এলেও গিলে নিতে হয়। সব্বাই যেতে চাইলে কি আর অত টিকিট কেনা সম্ভব?

দিদিমার মতই আমার আরেক বাল্যসখির কথাও শোনাব আজ। প্রকৃত নাম কাদম্বিনী সরকার। তাঁকে আমরা মনা ডাকতাম। সরকার তাঁর বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত পদবী। তিনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দার কনিষ্ঠা ভগ্নী। বিবাহসূত্রে দেশভাগের আগেই কুমিল্লার গ্রামের বাড়ি থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। খুবই অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল মনার। তাঁর স্বামীই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। উত্তর কলকাতায় তাঁদের বাসস্থানেই উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসা আমাদের যত আত্মীয়েরা ঠাঁই পেয়েছিলেন। দেশহীন বিভ্রান্ত মানুষগুলিকে পথে পড়ে থাকতে হয় নি এঁদেরই বদান্যতায়। কাউকে ফেরান নি এই নিঃসন্তান দম্পতি। মনার স্বামীও অত্যন্ত উদারমনা সহৃদয় মানুষ ছিলেন শুনেছি। তাঁর নানারকমের ব্যবসা ছিল। আমি মনার বরকে দেখি নি। গ্রামদেশে বড় হওয়া মনা স্বামীর প্রয়াণের পর বেশিরভাগ ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে শুধু সিঙ্গার মেশিনের ডিলারশিপ সহ আর দু'একটি ব্যবসা হাতে রেখেছিলেন। কলকাতা শহরের বুকে বসে সেই সেকালিনী দাপটের সঙ্গে নিজের ব্যবসাপত্র সামলে গেছেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী। রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত শিষ্যা। স্বপাকে খেতেন। কলকাতায় গেলেই মনার সর্বক্ষণের সঙ্গী হতাম। তাঁর দোকানে যেতাম, বায়না করে বাজারে গিয়ে মিষ্টি খেতাম। আমাদের গ্রামদেশে তখন সেসব মিষ্টি আর কোথায়?

একবার কাশীপুর উদ্যানবাটির কল্পতরু উৎসবে নিয়ে গেলেন মনা। কত ফুল, চারদিকের পবিত্র ভাব, স্তোত্রপাঠের সুর, সুশৃঙ্খল ভিড়; একটা আলাদা অনুভবের জগত তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তে। শত লোকের সঙ্গে বারান্দায় পাতপেড়ে খিচুড়ি প্রসাদ খেতে বসে কী আনন্দই পেয়েছি। কুমিল্লার বেলঘরগ্রাম থেকে আসা হরিদাদুও মনার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। ক্রমে সবাই নিজ নিজ ঠাঁই খুঁজে নিয়ে চলে গেলেও তার কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না, আত্মীয় পরিজনও তিনকূলে কেউ ছিল না। এবাড়িতেই বাজারহাট, রান্নাঘরের কাজ ইত্যাদি করতেন, মনার ছোটভাই ক'জন সপরিবারে এবাড়িতে থাকতেন।

যুবক বয়সে দেশ ছেড়ে এলেও আমি হরিদাদুকে দেখি তার প্রৌঢ়বয়সে। সিঁড়ির পাশের একচিলতে জায়গায় সরু তক্তপোশে ঘুমাত হরিদাদু। আমার পুতুলের কাপড় জামার খোঁজে একদিন আবিষ্কার করি হরিদাদুর খাটের নীচে রঙিন কাপড়চোপড়। সেসব টেনেটুনে বের করতে গিয়ে দাদু দেখে ফেলে, বারণ

করে। 'নিও না বইন, আমি তো রামলীলায় পালাটালা গাই, ওইখানের খুউব দরকারের সাজ। বুজচ, একদিন দ্যাকতে যাবা। হ্যাঁ বইন, যাইও। ক্যামন, এইগুলা সব সাজপোশাক। রোজই লাগে।' এই আমন্ত্রণের পরে আর ঘরে থাকা যায়? মনার কাছে শুরু হল ঘ্যানঘ্যানে বায়না। সেই রামলীলা না দেখলে জীবনই তো বৃথা! বাড়িতে হরিদাদুকে সব খোলসা করে বলতেই হল। গঙ্গারঘাটে রামলীলা হয় বটে রোজ। দর্শক ও অভিনেতা বেশিরভাগই জুটমিলের অবাঙালি কর্মীরা। কবে কীভাবে হরিদাদু তাদের সঙ্গে জুটেছে! আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করার জন্যে মনার কাছে বেশ বকাও খেল হরিদাদু। কিন্তু নাছোড়বান্দা আমাকে মনা আটকাতে পারল না। যাবই, নিয়ে যেতেই হবে। শয়নে স্বপনে জাগরণে রামলীলা দেখতে পাই যে! শেষতক মনার আঁচল ধরে নাট্যমঞ্চের ধারে হাজির হই। বাড়ির অন্যান্যদের নানা রকম বাঁকা মন্তব্য ও মায়ের হাতের কানমলা খেয়েও। 'এই মাইয়ার এমুন পিতলা শখ ক্যান? দুই থাপ্পড় দিয়া ঘরে বসাইয়া রাখ। হাতের লেখা কর রে মাইয়া ঘরে বইসা।' এমন ধারার নানা মন্তব্য নস্যাৎ করে গঙ্গার ঘাটে হাজির হলাম।

অনেকটা অভিনয় হয়েই গেছে। মঞ্চ বলতে চারদিকের খুটির মাথায় সামিয়ানা লাগানো। সামিয়ানার ওপর থেকেই হ্যাজাকের আলো আর কয়েকটা লেমনেডের বোতল ঝুলছে। সীতাদেবী একটা বাঁশের খুটোয় হেলান দিয়ে বসে, তার চারধারে কতিপয় আধশুকনো ডালপালা। 'হায় হায় রাম তুম কাঁহা গয়া' ইত্যাদি বলে কান্নাকাটি করছে সীতা, পরনে আধময়লা শাড়ি। ওখানে বসবার কোনও ব্যবস্থা নেই; চারদিকে জমাট একটা ভিড় স্তব্ধ হয়ে অভিনয় দেখছে। বিড়ি এবং আরও কিছুর গন্ধে ভারি বাতাস। হরিদাদুও মুখে নানা রকম শব্দ করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ল। অঙ্গে একটা জংলাছাপ হাফপ্যান্ট, পেছনে লম্বা ল্যাজ! হনুমান! লাফ দিয়ে এমাথা ওমাথা যাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে লাফিয়ে লেমনেডের বোতল পেড়ে এনে খাচ্ছে। এহেন অভূতপূর্ব রামলীলার দৃশ্য বিমোহিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকি। ল্যাজের মাথায় জড়ানো ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে খুব লাফঝাঁপ শুরু করে হরিদাদু; চারধার কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া! অভূতপূর্ব সব দৃশ্য চিরকালের মত মনের মণিকোঠায় গেঁথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

পড়াশুনো, চাকরি, জীবনের আরও কত ব্যস্ততায় কখন যে মামাবাড়ি যাতায়াত কমে যেতে যেতে প্রায় বন্ধই হয়ে গেল টের পাই নি। মামা নেই, দাদু নেই, শীতের সকালে উঠোনের রোদ্দুরে বসে, সকালের জলখাবার ঘি, আলুসেদ্ধয় মাখা ভাতের দলা খাওয়া নেই। আতপ চালের ম ম করা গন্ধও হারিয়ে গেছে কবে! সেদ্ধভাতের দলাপাকানোর সেই দরদি হাতটির মালকিন বড়মামীই কালস্রোতে ভেসে গেছেন কোথায়! আজ ভাবি নিজের চারটি আর ননদিনীর তিনটি, মোট সাতজন বাচ্চার দৌরাত্ম্য কেমন অবলীলায় সহ্য করে গেছেন মামীমা! বড়মামা সামান্য মাইনের চাকুরেই ছিলেন। শরীরে, মনে অনেক যন্ত্রণা সয়ে দিদিমাও চলে গেছেন বহুকাল। মনাও কবে পাড়ি দিয়েছেন দূরের পথে।

সদাব্যস্ত প্রাণচঞ্চল সব্বার প্রিয় মামণিদিও অকালেই অন্যলোকের যাত্রী হয়েছে; এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায়। জেনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, তখন মেসে থেকে বিএড পড়ছি। মা জানালেন মাত্র একসপ্তাহ আগেই সুদূর নাগপুর, স্বামীর কর্মস্থল থেকে ভিক্টরমাসিকে মামণিদি লিখেছিল, 'মা আজ আমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে। শান্তনু নীল রঙের খুব সুন্দর স্কুটার কিনেছে। এখন রোজ সকালে শিখছে।' দিন দশেকের মাথায় ন'মাসের বাচ্চা সমেত ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল সেই নীলরঙা স্কুটারে চেপে। ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ, মুহূর্তেই সব শেষ! এই অভাবিত মৃত্যু সবাইকে শোকগ্রস্ত করে রেখেছিল বহুদিন।

দিদিমা সুহাসিনী বা মনা কাদম্বিনী সেকালের আমার প্রিয়তম সইয়েরা, মামণিদি, হরিদাদু... সবার কথা ভাবলে অপূর্ব ভালবাসায় হৃদয় উদ্বেল হয় আজও! নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রাত্যহিক যাপনের মধ্য থেকে আনন্দরস আহরণ করে গেছেন ওনারা। বেনারসের সেই আচারওয়ালার মত জীবনের কাচের বয়ামে ভরা সুস্বাদু আচারের স্বাদ-গন্ধ ছড়িয়ে তারা ভেসে গেছেন কালের অমোঘ স্রোতে। হাতে ধরে পরিচয় করিয়েছেন জীবনের শত রূপ-রঙের-রসের সঙ্গে।

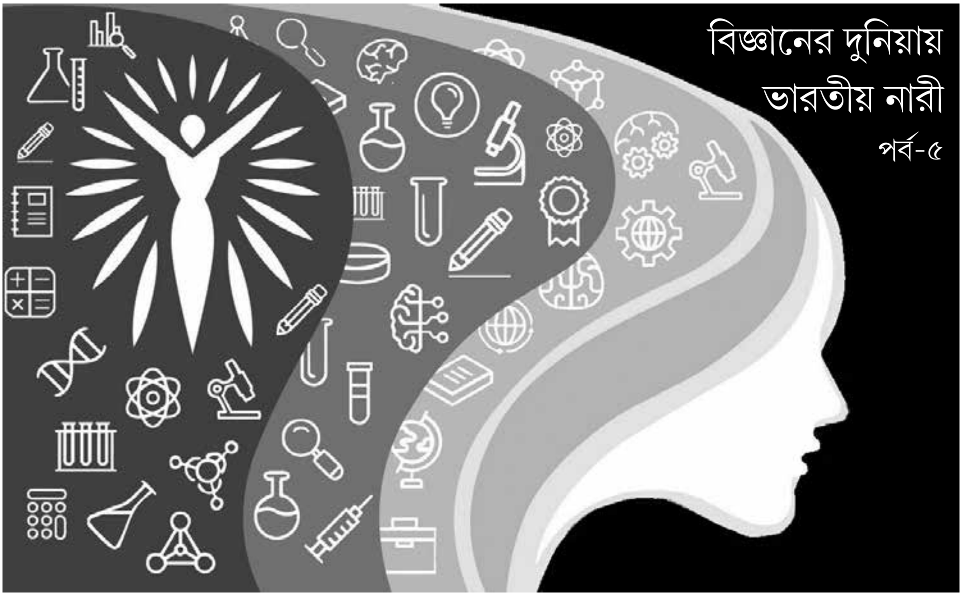

অসীমা চট্টোপাধ্যায়: ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট প্রাপ্ত প্রথম নারী

রাখি পুরকায়স্থ

বিজ্ঞান সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০২ সালের ১২ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি— বেঙ্গল কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ১৯৬৮ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালসের সঙ্গে একটি বিদেশি ওষুধ কোম্পানির জোরদার আইনি লড়াই বাধে। অভিযোগ, বেঙ্গল কেমিক্যালস নাকি সেই বিদেশি কম্পানির 'সালফোনামাইড ডিরাইভেটিভ' সংক্রান্ত পেটেন্ট অধিকার ভঙ্গ করেছে। কলকাতা উচ্চ আদালতে সেই বিদেশী কোম্পানির বিরুদ্ধে বিশেষজ্ঞ-সাক্ষী হিসেবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রেরই এক স্নেহধন্য ছাত্রী— স্বনামধন্য জৈব রসায়নবিদ ও গবেষক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান, প্রচণ্ড সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের জোরেই বেঙ্গল কেমিক্যালস সেই আইনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল!

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী শহর কলকাতায় ১৯১৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন অসীমা। বিশিষ্ট চিকিৎসক ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি এবং

কমলা দেবীর দুই সন্তানের মধ্যে অসীমাই ছিলেন বড়। বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে অসীমা যখন কলকাতায় বড় হচ্ছিলেন, তখন কোনও মহিলা রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করছেন, এমনটা ভাবা ছিল কষ্টকল্পনারও অতীত। কিন্তু অসীমা সেই ব্যতিক্রমী বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, অসীমার পরিবারটি সমকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির তুলনায় ছিল অনেক বেশি প্রগতিশীল। তাঁর পিতামাতা সর্বদা নিজের পছন্দমত বিষয়ে পড়াশোনা করতে তাঁকে উৎসাহ দিতেন।

শৈশব থেকেই অসামান্য মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন অসীমা। ১৯৩২ সালে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। দু'বছর পরে সেখান থেকেই আইএসসি পরীক্ষাতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দুটি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলেন। তাছাড়াও পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব লতিফ ও ফাদার লাফেঁর নামে বৃত্তি এবং হেমপ্রভা বসু স্মারক পদক।

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শেষে অসীমা ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সে-সময় একমাত্র এই কলেজেই মেয়েদের রসায়নে অনার্স পড়বার সুযোগ ছিল। এদিকে আবার ক্লাসের পড়ুয়াদের মধ্যে অসীমাই একমাত্র মেয়ে! তাই চারিদিক থেকে উঠেছিল প্রবল সমালোচনার ঝড়। তবু নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন অসীমা। তাঁর স্বপ্ন পূরণের পথে সহায় হয়েছিলেন মা কমলা দেবী। সামাজ নির্মিত দুর্লঙ্ঘনীয় লিঙ্গ-প্রাচীর অতিক্রম করবার এমন কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে অসীমার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। ১৯৩৬ সালে রসায়নে সাম্মানিক সহ স্নাতক হয়ে মায়ের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিলেন অসীমা। পেয়েছিলেন বাসন্তী দাস স্বর্ণপদক। ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল জৈব রসায়ন। পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত পদক এবং যোগমায়া দেবী স্বর্ণপদক।

অসীমার সুদীর্ঘ গবেষক জীবনের শুভারম্ভ ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রাকৃতিক পণ্য রসায়নবিদ অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার বসুর তত্ত্বাবধানে। এছাড়াও পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, পুলিন বিহারী সরকার, জগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয়দারঞ্জন রায়ের মত বিশিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। এঁরা সকলেই অসীমার ভবিষ্যৎ জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

অসীমা চট্টোপাধ্যায

গবেষণার পাশাপাশি ১৯৪০ সালে কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন অসীমা। ১৯৪৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ রসায়ন এবং কৃত্রিম জৈব রসায়নের ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট অব সায়েন্স' প্রাপ্ত প্রথম নারী হিসেবে ইতিহাসে তাঁর নাম সেদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। সে-বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে সাম্মানিক প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল— এই তিনটি বছর ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমেরিকা এবং ইউরোপের মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রসায়নবিদ্যার

অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এল.এম.পার্কসের সঙ্গে Naturally Occurring Glycosides বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপক এল.জেকমাইস্টারের সঙ্গে 'Carotenoids and Provitamin A' বিষয়ে গবেষণা করেন। সেই কাজের সূত্রে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াটুমুল ফেলোশিপ অর্জন করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক পল কারেরের সঙ্গে 'Biologically Active Indole Alkaloids' বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তিনি।

দেশে ফিরে এসে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদের রাসায়নিক গঠন নিয়ে নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু করেন। উদ্ভিদবিদ্যা চর্চায় প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর পিতার। সম্ভবত সেখান থেকেই উদ্ভিদের ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর ঝোঁক তৈরি হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্সের রসায়ন বিভাগে রিডার পদে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের ঐতিহ্যশালী খয়রা অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি ১৯৮২ সাল অবধি আসীন ছিলেন। তিনিই প্রথম নারী বিজ্ঞানী যিনি কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ সাল অবধি তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিনের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত 'Special Assistance Programme to intensify teaching and research in natural product chemistry' শীর্ষক কার্যক্রমটির Honorary Coordinator রূপে তিনি কাজ শুরু করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই। ১৯৮৫ সালে এই কার্যক্রমটি 'Centre of Advanced Studies on Natural Products' নামে স্বীকৃতি পায়।

আয়ুর্বেদিক ওষুধের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার জন্যে একটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং আয়ুর্বেদ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন তিনি। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় কলকাতার সল্ট লেক সিটিতে, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সহযোগিতায়, গড়ে ওঠে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ এন্ড সিদ্ধার অধীনস্থ Chemical Research and Extraction Supply Unit। জীবনান্ত পর্যন্ত অধিকর্তার পদে আসীন থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সযত্নে লালন করেছিলেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষক জীবন প্রায় ষাট বছর ব্যাপী বিস্তৃত। ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ভেষজ রসায়ন, বিশেষ করে উপাক্ষার, কুমারিন, টারপিনয়েড বিষয়ক গবেষণায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন এবং অধিযন্ত্রবাদী জৈব রসায়নে তাঁর গবেষণাকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি, ডঃ ডঃ চট্টোপাধ্যায় সর্বদা দেশীয় উদ্ভিদ থেকে ফাইটোকেমিক্যালস নিষ্কাশন করে তা ওষুধ বা ঔষধি উপাদান হিসাবে ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শুষনি শাক থেকে আয়ুষ-৫৬ নামক মৃগীরোগের ওষুধ সফলভাবে তৈরি করেছিলেন। ছাতিম, চিরতা, কুটকী, নাটাকরঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন আয়ুষ-৬৪ নামে ম্যালেরিয়ার ওষুধ। এই পেটেন্টযুক্ত ওষুধ দুটি বেশ কয়েকটি সংস্থা বাজারজাত করেছে।

প্রাকৃতিক যৌগ নিষ্কাশন এবং তাদের আণবিক ও ত্রিমাত্রিক গঠন নিরূপণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ডঃ চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে নয়নতারা গাছ থেকে নিষ্কাশিত ভিঙ্কা অ্যালকালয়েডের ওপর তাঁর গবেষণা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে। ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধির মাত্রা হ্রাস করতে এই পদার্থটি এখন কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বড় চন্দ্রিকা, সর্পগন্ধা, জটামানসি সহ নানান ভেষজ উদ্ভিদ থেকে তিনি বহু যৌগ নিষ্কাশন করেছিলেন এবং বিভিন্ন রোগে তাদের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন।

প্রায় সমস্ত মূল প্রকারের ইন্ডোল উপাক্ষারের রসায়নিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। আজমালাইসিন এবং সারপাজাইনের কাঠামো এবং স্টেরিওকেমিস্ট্রি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। বেশ কয়েকটি জটিল ইন্ডোল, কুইনোলাইন এবং আইসোকুইনোলাইন উপক্ষার সম্পর্কিত সাংশ্লেষিক গবেষণা করেছিলেন তিনি। ক্ষারক সংশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত বিটা-ফিনাইলিথ্যালামাইন প্রস্তুত করার পদ্ধতিও নিরূপণ করেছিলেন। হাঁপানি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত এফিড্রিন যৌগ বিষয়ে তাঁর গবেষণা স্নাতক স্তরের বইতে স্থান পেয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকীগুলিতে তাঁর রচিত প্রায় ৪০০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন নামী বিজ্ঞান সাময়িকীতে তাঁর লেখা পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সে-সব মূল্যবান গবেষণাভিত্তিক রচনাগুলি বিশ্বজুড়ে নানান গবেষণাপত্রে আজও ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা হয়। তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিংবদন্তি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের উৎসাহে তিনি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে ‘সরল মাধ্যমিক রসায়ন’ নামে বাংলা ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন। সত্যেন বোস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বইটি প্রকাশ করেছিল। ডঃ কালীপদ বিশ্বাস এবং শ্রী এককড়ি ঘোষ বিরচিত ‘ভারতীয় বনৌষধি’ শীর্ষক ছ’টি খণ্ডের একটি গ্রন্থ পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করেন তিনি (১-৫ খণ্ডঃ ১৯৭৩ সাল, ৬ খণ্ডঃ ১৯৭৪ সাল)। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর ছাত্র ডঃ সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশির সঙ্গে যৌথভাবে তিনি রচনা করেন The Treatise on Indian Medicinal Plants শীর্ষক একটি ইংরেজি গ্রন্থ। ১৯৯২ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR, India) ছয় খণ্ডে বইটি প্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালের সম্পাদকের পদে এবং ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রির সম্পাদকীয় বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯৬০ সালে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। প্রাকৃতিক পণ্য রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য CSIR– India তাঁকে ১৯৬১ সালে রসায়নে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রদান করে।

১৯৭৫ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী বিজ্ঞানী যিনি এই পদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশনে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট ও দৃপ্ত কণ্ঠের সভাপতির ভাষণ— ‘ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ’ —চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সেই ভাষণের প্রতিটি শব্দ তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা এবং দূরদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটায়। সে-বছরই ‘আন্তর্জাতিক নারী বৎসর’ উপলক্ষে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স তাঁকে ‘বর্ষসেরা নারী’ ঘোষণা করে সম্মানিত করে।

বিজ্ঞানে অপরিমেয় অবদানের জন্যে ডঃ চট্টোপাধ্যায় একাধিক পুরস্কার এবং সম্মান লাভ করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছেঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নাগার্জুন স্বর্ণপদক (১৯৪০), প্রেমচাঁদ রায়চাদ ছাত্রবৃত্তি (১৯৪২), ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রদত্ত স্যার পিসি রায় পুরস্কার (১৯৭৪); ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ (১৯৭৫); ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৮১); বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত স্যার সিভি রমন পুরস্কার (১৯৮২); ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি প্রদত্ত শিশিরকুমার মিত্র স্মৃতি বক্তৃতা সম্মান (১৯৮৪); ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রদত্ত অধ্যাপক পিকে বোস পুরস্কার (১৯৮৮); ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক (১৯৮৯); কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত গোয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (১৯৯২); ইন্দিরা গান্ধী প্রিয়দর্শিনী পুরস্কার (১৯৯৪); ভারত সরকারের সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ এন্ড সিদ্ধা প্রদত্ত রজত জয়ন্তী পুরস্কার (১৯৯৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এমিনেন্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড

(১৯৯৬), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত রথীন্দ্র পুরস্কার (১৯৯৭), কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'বিজ্ঞান ভারতী' উপাধি (১৯৯৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক (১৯৯৯), পিসি চন্দ্র পুরস্কার (২০০১) ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি সাম্মানিক 'ডক্টরেট অব সয়েন্স' ডিগ্রি পেয়েছেন বর্ধমান (১৯৭৬), কল্যাণী (১৯৯৯), বিদ্যাসাগর (২০০৬) এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮২) থেকে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভা-সম্মেলনে অংশ নিতে এবং তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন। তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন— কুয়ালালামপুরে (১৯৫৭) এবং হংকংয়ে (১৯৬১) অনুষ্ঠিত ফাইটোকেমিস্ট্রি বিষয়ক ইউনেস্কোর সিম্পোজিয়ামে; এবং জুরিখে (১৯৫৫), অস্ট্রেলিয়ায় (১৯৬০), জাপানে (১৯৬৪) এবং সোভিয়েত ইউনিউনে (১৯৭০) অনুষ্ঠিত প্রাকৃতিক পণ্য রসায়ন সম্পর্কিত ইউপিএসি সিম্পোসিয়ামে। ১৯৬৫ সালে ইন্দো-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অধীনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শীর্ষস্থানীয় সদস্য হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেছিলেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাকৃতিক পণ্য বিষয়ক অষ্টম ইন্দো-সোভিয়েত সিম্পোজিয়ামে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন পরিষদের উপদেষ্টা। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৯০ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। এছাড়াও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাগ এনকুয়ারি কমিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক গঠিত মানব প্রজনন গবেষণা সম্বন্ধীয় জাতীয় কমিটি, ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভ্যাশন অব সায়েন্সের সদস্য ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিগমা এক্সআই এবং লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিরও সম্মানিত সদস্য ছিলেন তিনি।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। চোদ্দ বছর সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত ব্যস্ততার মধ্যেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা জারি রেখেছিলেন এই প্রতিভাময়ী।

ব্যক্তিগত জীবনে ডঃ চট্টোপাধ্যায় আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতই সংসারী ছিলেন। হাওড়ায় অবস্থিত শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও ধাতুবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান, এবং পরবর্তীকালে উপাধক্ষ্য, স্বনামধন্য ভৌত-রসায়নবিদ অধ্যাপক ডঃ বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। অধ্যাপক বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর অবিচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা, অবিরাম উৎসাহ এবং নিঃস্বার্থ সহযোগিতা পেয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় সংসার সামলেও বিজ্ঞানের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ডঃ জুলি ব্যানার্জিও পরবর্তীকালে মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জৈব রসায়ন বিষয়েই গবেষণা করেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

১৯৮২ সালে ডঃ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গবেষণাতে কিন্তু ছেদ পড়ে নি। ২০০৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন এবং গবেষণাতে অংশ নিয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেছেন। বহু বিজ্ঞান শিক্ষার্থী তাঁর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি এবং ডিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে তাঁর গবেষণার পথ মোটেই নিষ্কণ্টক ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে সুযোগসুবিধা ছিল অপ্রতুল। আর্থিক অসুবিধা ছিল

প্রধান বাধা। গবেষকদের বৃত্তি ছিল নগণ্য। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগারের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র তিনশো টাকা। গবেষণার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বোস ইনস্টিটিউট বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগগুলির ওপর নির্ভর করতে হত। তাছাড়া বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি পেতে তাঁকে পুরুষদের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তবে একে একে সব প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে।

শান্ত-সুন্দর চেহারার এই ব্যক্তিময়ী বিজ্ঞান সাধিকাটি সবসময় তাঁর নিকটজনদের বলতেন, 'যতদিন বাঁচব ততদিনই কাজ করে যাব।' তাঁর সেই চাওয়া পূর্ণ হয়েছিল। বাস্তবে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গিয়েছেন মানুষের কল্যাণে। দীর্ঘ কর্মবহুল জীবন শেষে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে পর্যন্ত তিনি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর গবেষণাপত্রের তালিকাতে শেষ সংযোজন ঘটে ২০০৭ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর। মৃত্যুর আগে কোমায় চলে যাওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ আগে তাঁকে কলকাতার 'সম্মানিত নাগরিক' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

নিরলস বিজ্ঞান সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর কর্তব্য নিষ্ঠা এবং অদম্য জ্ঞান তৃষ্ণা তাঁকে আজ কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত করেছে। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন এক 'কর্ম যোগী', যিনি ফলের আশা না করেই নিজ কর্ম সম্পাদনে বিশ্বাসী ছিলেন। সরলতা, সৌজন্যতা, ভালবাসা দিয়ে তিনি সকলের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে 'মাষ্টার' ডাকতেন, বয়সে ছোটরা ডাকতেন 'দিদি' আর বাকিরা ডাকতেন 'মা'! একবার তাঁর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান গবেষণায় নারী জাতির অক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মনে যে অযৌক্তিক ধারণাটি যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে অসীমা চট্টোপাধ্যায় সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন সকলের মাঝে।'

প্রকাশিত হল

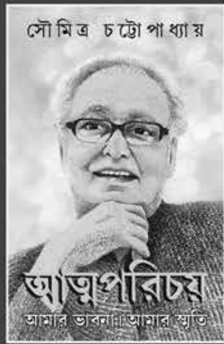

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
আত্মপরিচয় 395/-
'জার্নালের মতো করে নিজের ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা এমনকি স্মৃতি সংলগ্ন কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিকের রবিবারের পাতায় মাঝে মাঝে কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার আগ্রহ ক্বচিৎ কখনও আন্দোলিত হলেও অনেকদিন অবধি এটিকে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি।'

সমরেশ মজুমদার
সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে
হায় সজনি
চূড়ান্ত রোম্যান্টিক উপন্যাস 199/-
উত্তরবঙ্গে প্রাপ্তিস্থান: ডুয়ার্স বুকস ডট কম, সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১, হোম ডেলিভারি ফোন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

প্রবাসী কন্যার মেয়েবেলা। ১

নিরন্তর খুঁজে ফিরি আমার সেই চালসাকে

ড. ইন্দ্রানী রায়

চালসা নামটা শুনলেই মন উচাটন হয়ে যায়— এক আত্মিক টান অনুভব করি! সেই ছোট্টবেলা থেকে হয়ত বা জন্মমুহূর্ত থেকেই উত্তরবঙ্গের জঙ্গল-পাহাড়ের সাথে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলাম— সেই স্মৃতিবিজরিত ডুয়ার্সের চালসা-মঙ্গলবাড়ি-বাজাবাড়ি-লাটাগুড়ি আমাকে এখনও চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, কালের গতিতে সেই আকর্ষণ অনেক ক্ষীণ হয়ে এলেও এতটুকু আলগা হয়নি, বিচ্যুত হয়নি। আমার বাবার কর্মসূত্রে আমার জন্ম চালসায়— এক স্বপ্নময় চা-বাগিচার ভূমিসূতা আমি। ষাটের দশকে ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত অপরূপ মনোময় ছিল এই ভূমিদেশ চালসা। এইদিকে আঁকাবাকা পথে স্বপ্নের সিঁড়ির মত সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে মেটেলির রাস্তা, উত্‌রাই এ চলে গেছে উপর চালসা, আর ঢাল বেয়ে খানিকটা সমতলে নিচ চালসা। পরবর্তী জীবনে লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ড যাবার পথে অমন অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অথবা গোয়ার ডাবোলিম এয়ারপোর্ট থেকে সমুদ্র-পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর যুগলবন্দি রূপ আমার কাছে ম্লান হয়ে যায়— আমার চোখে যে ছোট্ট সবুজ চালসার রূপ লেগে আছে।

আমাদের বাড়ি ছিল নিচ চালসায়— বারান্দা থেকে দেখতে পেতাম ডানদিকে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান, ধাপে ধাপে বিছানো সবুজ মখমলের চাদরের মত, মাঝে মাঝে ছায়া প্রদানকারী কিছু গাছ, কারণ তখন আমাদের বাড়ির পর আর কোনও বাড়ি ছিল না। আর বাঁ দিকে সবুজ পাহাড় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে, বাড়ির সামনের মাঠ পেরলেই কালো পিচঢালা রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩১ নম্বর, রাস্তার ওপারের প্রান্তদেশে ডুয়ার্সের তরাইয়ের ঘন আদিম বনভূমি।

চওড়া রাস্তার দু'ধারে শাল, বকুল, তেঁতুল, কাঁঠাল গাছের সারি— কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি হয়ে উঠত। একদিকে খরস্রোতা পাহাড়ি শিলাময় কূর্তিনদী, অন্য প্রান্তে জঙ্গলের বুক চিরে প্রস্তরবেষ্ঠিত মূর্তি নদী যেন চালসা নামক ভূমিদেশকে দু'দিকে ধরে রেখেছে। গরুমারার দুর্গম দুর্ভেদ্য বনভূমি সংলগ্ন চালসাতে তখন বাস ছিল স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষের। ষাটের দশকে ডুয়ার্স রিসর্ট সমৃদ্ধ পর্যটনভূমি হয়ে ওঠে নি। হিংস্র বন্যপ্রাণী আর হাতির দল তখন প্রায়শই লোকালয়ে মানুষের বসতভূমিতে হানা দিত, তাই

তখন চালসার সব বাড়িঘরই ছিল উঁচু উঁচু কাঠের পিলারের উপর তৈরি কাঠের বাড়ি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অরগ্যানিক কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর আমার বাবা সত্যেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী দেশবিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে এসে খড়্গপুরে রেলবিভাগে চাকরি পেলেও আদ্যন্ত কর্মযোগী অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষটি পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে সরকারি চাকরি ছেড়ে পাড়ি দিলেন উত্তরবঙ্গের দুর্গম জঙ্গল আর পাহাড় অধ্যুষিত এলাকাতে। তখন না ছিল তাঁর কোনও পুঁজি না ছিল যাতায়াত বা যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা। তখন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগকারী গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা সেতু হয় নি, তাই গঙ্গা নদী পার হতে হত স্টিমারে, মণিহারীঘাট আর সক্রিগলিঘাটের চর পেরিয়ে। এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে আমার বাবা ডুয়ার্সকে নিজভূমি মনে করে শুরু করেছিলেন তাঁর পথচলার কর্মকাণ্ড চালসাতে বাসস্থান বানিয়ে।

তখন আমার জন্ম হয় নি। নিচ চালসাতে একুশ কাঠা জমির উপর আমাদের বাড়িটা ছিল অনেকগুলো লাল সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে অনেকটা উঁচুতে চালসার প্রথম পাকা বাড়ি। দেশবিভাগের ফলে ঢাকা থেকে বাড়িঘর ছেড়ে প্রায় একবস্ত্রে এদেশে চলে আসা আমার জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমায়েরা ও নিঃসন্তান বিধবা পিসিমা এসে উঠলেন আমাদের চালসার বাড়িতে— শুরু হল এই দেশে আমার মায়ের যৌথসংসার। ময়মনসিংহ থেকে এলেন আমার বড়মামা। আজীবন দাপুটে, আপসহীন ব্যক্তিত্বের আমার এই মামা চালসাকে ভালবেসে আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের অন্নসংস্থানের জন্য বাবা তখন ছুটে চলেছেন নানা ব্যস্ততায় নানা কর্মসন্ধানে, গড়ে তুললেন বাবার নিজস্ব বাণিজ্যিক সংস্থা— নর্দান কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।

দুর্গম দুর্ভেদ্য জঙ্গল বেষ্টিত চাপরামারিতে প্রথম পাকা রাস্তা তৈরি হল বাবার তত্ত্বাবধানে, তৈরি হল কূর্তি নদীর উপর সেতু বাবার অনুপ্রেরণায়, যার ফলে চালসার সাথে ডুয়ার্সের অন্য প্রান্তের যাতায়াতের পথ সুগম হয়ে উঠল। তখন পাহাড়ি নদী জলঢাকার উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হচ্ছে। বাবা চালসার সমতল ছেড়ে চললেন আরও আরও দুর্গম পাহাড়ি পথের দিকে, চালসা থেকে খুনিয়ামোড় পেরিয়ে জলঢাকার দিকে— ঝালং, বিন্দুর পথে।

তখন ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোতে একটা করে দুর্গাপুজো হত। চালসাতে হত না বলে চালসার সব মা-কাকিমা-জেঠিমারা ট্রাকে করে অন্যান্য চা-বাগানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে যেতেন। সেটা ছিল দারুণ এক আনন্দের ব্যাপার। মায়ের কাছে শুনেছি একবার সব মা-কাকিমারা মিলে মহিলাসমিতি গড়ে উপর চালসাতে খানিকটা সমতল উপত্যকা মতন জায়গায় 'চালসা ক্লাব' তৈরি করে দুর্গাপুজোর শুরু করেছিলেন। এই চালসা ক্লাবেই ডুয়ার্সের প্রথম 'রিভলভিং স্টেজ' তৈরি হয়েছিল, তাতে সমস্ত চালসার মহিলারা মঞ্চস্থ করেছিলেন 'বিন্দুর ছেলে'।

মহালয়া শোনার জন্য তখন ওখানে বিশেষ কারও বাড়িতেই রেডিও ছিল না, আমার মনে পড়ে বাবা একবার মালবাজার থেকে ব্যাটারিচালিত ঢাউস এক রেডিও কিনে আনলেন, সেদিন রাতে আমাদের চোখে ঘুম ছিল না। আমাদের বাড়ির সামনের লনে বাঁশ পুঁতে তাতে মাইক লাগানো হল যাতে সারা সারা চালসার লোক মহালয়া শুনতে পারে।

কালীপুজোর আগে 'ঢেউচি' নাচ ছিল ডুয়ার্সের আদিবাসীদের এক অন্যতম বিনোদন। ডুয়ার্সের সব চা-বাগানেই চা-পাতা তোলার কাজ করে 'মদেশিয়া' নামে এক আদিবাসী জাতি। ইংরেজ শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণের প্রথমযুগে চা-বাগিচায় শ্রমিক রূপে খুব সস্তায় ছোটনাগপুর, রাঁচি, মধ্যপ্রদেশ থেকে এই অস্ট্রিক আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়েছিল— সেটা আমরা সবাই জানি। এই মদেশিয়ারা দেওয়ালির আগে মুখে নানা রং মেখে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দল বেঁধে 'ঢেউচি' নাচ করতে আসত। খুব ভয় পেতাম ছোটবেলায় ওদের দেখে, তাই ঘর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আর মজা পেতাম।

স্বাধীনতার পরও কিছু ইংরেজ সাহেব এদেশে থেকে গিয়েছিলেন। তেমনই চালসা বাগানের এক সাহেব ম্যানেজার এক মদেশিয়া আদিবাসী রমণীকে বিয়ে করে চালসাতে থেকে গিয়েছিলেন। মায়ের

কাছে শুনেছি এক সুদৃশ্য কাঠের বাংলো বানিয়ে সাহেব-ম্যানেজার আদিবাসী নববধূর সম্মানে চালসার সবাইকে চা-পানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

মনে পড়ে চালসা থেকে লাটাগুড়ির ঘন বিস্তৃত দুর্গম দুর্ভেদ্য জঙ্গল পার হবার সময় গাড়ির সামনে চিতাবাঘ বা হাতির আনাগোনাও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। লাটাগুড়ির জঙ্গলে একটি গাছের গুড়িতে কিছু সিঁদুরমাখা কালো পাথর বসানো আছে, জায়গাটিকে 'মহাকাল' বলে। এটি বন্য হাতিদের যাতায়াতের পথে, তবু সব মহাকালের সামনে দাঁড়িয়ে যায় তারপর আবার পথচলা শুরু করে। মহাকালের এই কালো পাথরটি নাকি খুব জাগ্রত!

ষাটের দশকে চালসাতে স্কুল ছিল না, তাই চালসার সব ছেলেমেয়েরা মালবাজারের স্কুলে পড়তে যেত, অল্প সংখ্যক বাস তখন যাতায়াত করত, এই বাস না পেলে মালবাজার থেকে হেঁটে স্কুল থেকে ফিরতে হত। আমার দাদা দিদিরাও মালবাজার যেত, এত দূরের পথে মা আপত্তি করতেন, আমি ছোট ছিলাম, বাবা দিদিদের বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, মা তাতে বাধ সাধলেন। এরই মধ্যে বাবার কর্মযজ্ঞের ব্যস্ততার মাঝে মা ঠিক করলেন পড়াশোনার জন্য জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসবেন। তখনও চালসা জলপাইগুড়ির মধ্যে যোগাযোগকারী তিস্তা নদীর সেতু তৈরি হয় নি, তাই নৌকো করে তিস্তা নদী ও তার চর পেরিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে আসতে হত। আমার মা অসম্ভব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আমাদের নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে চলে এসে দাদা দিদিদের স্কুলে ভর্তি করালেন— শুরু হল আমাদের চালসা ছেড়ে চলে এসে জলপাইগুড়ি বাস। এত বছর আগে মায়ের এই ভবিষ্যত দৃষ্টির ফলে আমরা সবাই ঠিকমত লেখাপড়া করে জীবনে চলার পথে এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

তবে এখন প্রচুর মানুষের কোলাহল জনবসতি, আর পর্যটকদের ভিড়ে আর আগের চালসাকে খুঁজে পাই না, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই এক টুকরো সবুজ ভূমিদেশ আর তার বনভূমি। তবু চালসার এই ভূমিকন্যা স্মৃতি আঁকড়ে বয়ে চলেছে সারা জীবন হয়ত বা আমৃত্যু।

পুরাণের নারী

বিষ্ণু পুরাণের নারী শৈব্যা

শাঁওলি দে

পুরাকালে শৈব্যা নামে এক রাণীর নাম লোকমুখে ফেরে। তিনি ছিলেন রাজা হরিশচন্দ্রের পত্নী। স্বামীর মত দানশীলতার জন্যই তিনি পরিচিত। শৈব্যার নাম শুনলেই প্রথমেই আমাদের হরিশচন্দ্রের পত্নীর নামই মনে পড়ে।

বিষ্ণুপুরাণেও আমরা একজন শৈব্যার নাম পাই। ঘটনাচক্রে তিনিও এক রাণী। পুরাকালে রাজা শতধনু নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যকে নিজের সন্তানের মতই দেখতেন। রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মচর্চা ও পূজা অর্চনাও করতেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল শৈব্যা। তিনিও ছিলেন ধার্মিক। স্বামীর রাজা শতধনু বৃদ্ধ বয়সে পরোলোকগমন করলে পরম দুঃখে তাঁর স্ত্রীও সেই চিতায় সহমৃতা হন। শতধনুর স্ত্রীর নাম ছিল শৈব্যা।

এই ঘটনার বহুকাল পর কাশীরাজ্যে এক রাজকন্যার জন্ম হয়। শতধনু পত্নী শৈব্যাই আবার জন্ম নেন কাশীরাজ্যে। একটু বড় হতে দেখা যায় রাজকন্যা অন্যান্যদের মত খেলাধূলো করে না, বদলে পূজা অর্চনাতেই তাঁর মন বেশি। দেবতার প্রতি ভক্তি দেখে সকলেই অবাক। কে শেখাল এমন? এর উত্তর আর মেলে না।

সময় এগিয়ে যায়, রাজকন্যার বিয়ের বয়স হয়। কাশীরাজ চিন্তিত হন, সুপাত্রের সন্ধান করেন। রাজাকে চিন্তিত দেখে রাজকন্যা একদিন তাঁকে বলেন, 'বাবা চিন্তা কোরো না, আমার যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে তাঁকে আমি চিনি। যথাসময়েই আমাদের বিয়ে হবে।'

রাজা আশ্বস্ত হলেও সম্পূর্ণ স্বস্তি পেলেন না। এমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মত গুণবতী, ধীর স্থির মেয়ে নিজে করবে পাত্র ঠিক? এও সম্ভব? তবু মেয়ের কথার ওপর আস্থা রাখলেন তিনি।

শতধনু পত্নী শৈব্যা ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। সেজন্য কাশীরাজ কন্যা হিসেবে জন্ম লাভ করে শৈব্যা হলেন জাতিস্মর। ধ্যান করে তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁর স্বামী শতধনুর কথা। তিনি তখন বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর খোঁজে বের হলেন। অন্যদিকে আগের জন্মে কৃত এক পাপকর্মের কারণে শতধনু কুকুররূপে কুকুরের যোনিতেই জন্ম নেন।

রাজা শতধনু আগের জন্মে স্ত্রীর সঙ্গে একবার মৌনব্রত করে গঙ্গায় গিয়েছিলেন স্নান করতে। কিন্তু তাঁর গুরুর পাষণ্ড এক সখার সঙ্গে কথা বলে ব্রতভঙ্গ করেন তিনি। সেই দোষে তাঁর কুকুররূপে জন্ম হয়।

ধ্যানের মাধ্যমে শৈব্যা জানতে পারেন যে তাঁর স্বামী আছে বৈদিশপুরে। সেখানে গেলে কুকুররূপী স্বামীকে দেখে চিনতে পারলেন রাণী। বন্দনা করলেন স্বামীর, আহার দেন ভক্তিভরে। কুকুররূপী শতধনু কুকুরের স্বভাবমতই শৈব্যার অনুগত হয়ে পড়লেন। তখন রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে কুকুরটিকে মনে করান পূর্বজন্মের স্মৃতি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়লে রাজার অনুশোচনা হয়, মনের ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে ওঁর। দুঃখে এক গিরিশৃঙ্গের ওপরে উঠে ঝাঁপ দেন কুকুররূপী রাজা শতধনু।

এরপর শতধনুর জন্ম হয় শৃগালরূপে। কাশীরাজ কন্যা ধ্যানযোগে আবার তা জানতে পেরে গেলেন কোলাহল পর্বতে। সেখানে গিয়েই দেখা মিলল শৃগালের সঙ্গে। আবার তাঁকে সব কথা মনে করালেন শৈব্যা। পত্নীর কথা শুনে সব মনে পড়ে গেলে রাগে অনাহারে নিজের প্রাণ ত্যাগ করলেন শৃগালরূপী রাজা।

এবার রাজার জন্ম হল নেকড়ে বাঘের যোনিতে। আবার শৈব্যা সব জানিয়ে স্মরণ করালেন, রাজা আবার দেহত্যাগ করে এবার শকুনের জন্ম নিলেন। শকুনের পর রাজা শতধনু প্রথমে কাক ও পরে ময়ূর রূপে জন্ম নিয়েছিলেন।

ময়ূরটিকে খুব যত্নে রাখলেন রাজকন্যা। কিছুই মনে করালেন না তাঁকে। নানা রকম খাওয়ার দিয়ে যত্ন করতে শুরু করলেন। কিছুদিন পর রাজকন্যা শৈব্যা শুনলেন রাজা জনক এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ঞের স্থানে গিয়ে রাজকন্যা নিজেও স্নান করে, ময়ূরটিকেও স্নান করান। তারপর তাঁকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করালে মনের দুঃখে ময়ূরটি যজ্ঞাগারেই প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজকন্যা এরপর ফিরে যান নিজের রাজ্য কাশীপুরে।

রাজা জনকের যজ্ঞাগারে মৃত্যু হয়েছিল বলে এর কিছুকাল পর রাজা জনকের ঘরেই রাজপুত্ররূপে জন্ম হয় রাজা শতধনুর। যৌবনকালে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন, সকলের মুখে মুখে ফিরত রাজপুত্র শতধনুর নাম।

এক পাষণ্ডীর সঙ্গে কথা বলে মৌনব্রত ভঙ্গ করার দোষে বেশ কয়েকবার নিচ যোনিতে জন্ম হয়েছিল রাজার। যজ্ঞাগারে মৃত্যুর পর তাঁর সেই দোষস্খলন হল। তিনি রাজপুত্র হলেন।

কাশীরাজ কন্যা এবার তাঁর বাবাকে ডেকে স্বয়ম্বরসভার আয়োজন করতে বললেন। সেই সভায় দেশ বিদেশের রাজা রাজপুত্রের সঙ্গে এলেন জনকরাজ পুত্র শতধনুও। রাজকন্যা শৈব্যা তাঁকে দেখলেন, চিনলেন। এরপর রাজপুত্রকে পূর্বজন্মের সব কাহিনী জানিয়ে বরমালা পরালেন। সকলে আনন্দে জয়জয়কার করে উঠল। এতকাল পর শৈব্যা ফিরে পেলেন তাঁর স্বামী শতধনুকে, যাঁর সঙ্গে তিনি একই চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন।

স্বামীর জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী পুরাকালে প্রচুর পাওয়া যায়। শৈব্যা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। এতকাল অপেক্ষা ও নানা পরীক্ষা দিয়ে স্বামীকে পাওয়ার যে চেষ্টা শৈব্যা করেছিলেন তা দৃষ্টান্ত। তবু বেহুলা, সত্যবতীর কাহিনীর মাঝে কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে রাজকন্যা শৈব্যার গল্প।

হরেক মাল দশ টাকা

দেবায়ন চৌধুরী

তখনও কলাগাছের খোলে বধূবরণের মাছ ভাত ছিল। শালপাতা চাটতে চাটতে সুতো উঠে আসা ছিল, বাড়িতে অতিথি এলে সিন্দুক থেকে কাঁসার বাসন বের হতো। কাজের মাসি গজগজ করতে করতে তেঁতুল ঘষে প্রদীপ মাজত। উপুড় করা পাথরের থালা বেয়ে জল চলে যেত তুলসী মঞ্চের দিকে। তখনও প্লাস্টিক রাজপাট ধর্মপাট নিয়ে নেয়নি, ভেঙে গেলে ভাঙা কাচ আর মন যে জোড়া যায় না, গান সে কথাই বলত, কিন্তু এসে গিয়েছিল হরেক মাল। গালামাল মানে মুদির দোকান, গোলমাল মানে ঝামেলা, চোরাই মাল মানে প্রাণ চায় পুলিশও... ঢিং চ্যাক ঢিং চ্যাক বন্দুক, আর হরেক মাল মানে হাজার খুশির হ্যালোজেন। মাত্র দশ টাকায়। 'লে লে বাবু ছে আনা'-র যুগ আমরা দেখিনি। ওটা বাবাদের কাল।

শীতের দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ, ছোট্ট পিঁড়িতে বসে কেউ সরতা দিয়ে সুপুরি কাটছে ঝিরিঝিরি, কেউবা গল্প বলে সোয়েটার বুনছে। সুয্যিমামা যাই যাই করছে, মৃদু আলোয় পড়ন্ত কুয়াশার পথে এসে যেত তারা... রকমারি জিনিসের আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে।

ছোট্ট আয়না, ধূপকাঠির স্ট্যান্ড, সুগন্ধি পাউডার, বদনা... হুমড়ি খেয়ে সে কী দেখা, দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, দোকানদার প্রশান্ত বদনে বলেই যাচ্ছেন যা নেবেন সব দশ টাকা। গোপালের জন্য কেনা হল গ্লাস, বাটি, প্লেট... মানুষের জন্য জিভ পরিষ্কারের কাঠি, জামা মেলবার ক্লিপ, সাবানকেস আর অতি অবশ্যই সেফটি পিন। সন্ধে নেমে এসেছে পুরোদমে, মাথার ওপর মশাদের গোল পাকানো, দিদি তাড়াতাড়ি করুন, এই নিন... টাকাটা মাছ বাজারের বোধহয়... বিস্ময়, হাসি, দ্বিধা আর সব কিনতে না পারার মনখারাপকে নিয়ে ঘরে ফেরে বাচ্চা কোলে মা। বালকের দল কী নেবে ভেবে পায় না, কিছু একটা দরকার ভাবতে ভাবতে কিছু বুঝতে না পেয়ে সল্টপট কিনে নেয়। ধীরে ধীরে গলিপথ বেয়ে হরেকমালের দোকানের ছোট্ট হ্যাজাক জ্বলে ওঠে।

আলোর পসরা নিয়ে যারা হেঁটে যায় তারা কেনও যে পেছন ফেরে না...

পাতাবাহার

অর্গানিক কেক বাড়িতে বানান

করোনা এসে আমাদের চেতনা বাড়িয়েছে। আমরা কমবেশি স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছি। সিন্থেটিক কৃত্রিম খাদ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে এখন মানুষ যেদিকে অর্গানিক দেখে সেই দিকেই ধায়। লাইফস্টাইলে খাদ্যাভ্যাসে বদল এনেছে অতিমারি। নিজে এবং পরিবারের সবাইকে সুস্থ জীবন দিতে হলে যতটা পারা যায় অনুযায়ী চলতে গেলে বানিয়ে খেতেই হবে এই কেকটি। এটাকে ডেজার্ট হিসেবেও খাওয়া যেতে পারে।

১। **উপকরণ যা যা লাগবে তার তালিকা**

গাজর চারশ গ্রাম, পোল্ট্রি মুরগির ডিম ৩টা, পৌনে এক কাপ কিসমিস আর প্রুনস বা কারেন্ট, অর্ধেক কাপ বা তিন টেবিল চামচ মেপ্‌ল সিরাপ অথবা মধু, ১টা মাঝারি আপেল সেদ্ধ, হাফ কাপ ফুল ক্রীম দুধের সর, হাফ কাপ অলিভ অয়েল বা বাটার বা অন্য কোনও নিউট্রাল ফ্লেভারের হালকা তেল, ২ চামচ দারুচিনি পাউডার, ১ চামচ আদা পাউডার বা আদাবাটা, আধা চামচ জায়ফল পাউডার, আধা চামচ সি সল্ট, ১ চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ৫০ গ্রাম নারকোল পাউডার বা নারকোল কোরানো, ১০০ গ্রাম ওটস পাউডার, ৭০ গ্রাম আমন্ড পাউডার, ১ চামচ বেকিং পাউডার, আখরোট কুচি পরিমাণ মত, ড্রেসিং-এর জন্য ক্রীম চীজ অথবা সমপরিমাণ ছানা আর হাং কার্ড।

২। সব কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে কেক বানানো শুরু করতে হবে। কিসমিস আর প্রুনসগুলো বাটিতে গরমজলে ভিজিয়ে রাখতে হবে প্রথমে। তারপর গাজরের খোসা ছাড়িয়ে গ্রেড করে নিতে হবে। ওটস শুকনো খোলায় সামান্য ভেজে পাউডার করে নিতে হবে। আমন্ডের পাউডার বানিয়ে রাখতে হবে। আপেল ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে পেস্ট বানিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। সবকিছুই নরমাল রুম টেম্পারেচার এর হওয়া দরকার।

৩। মিক্সারের বড় জারটিতে গাজর দিয়ে সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে বাটিতে আলাদা করে নামিয়ে রেখে ওই জারেই একে একে ডিম, আপেল পিউরি, মেপ্‌ল সিরাপ (অন্যথায় মধু), দুধের সর, অলিভ অয়েল, দারচিনি, আদা আর জায়ফল পাউডার, সি সল্ট আর ভ্যানিলা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে এক দু মিনিট।

৪। এরপর আমন্ড পাউডার, ওটস পাউডার, কোকোনাট পাউডার আর বেকিং পাউডার মিক্সিতে আবার এক আধ মিনিট ঘুরিয়ে এরপর তাতে দিতে হবে গাজর, কিসমিস প্রুনস (জল ঝরিয়ে) আর আখরোট। এবার সামান্য কয়েক সেকেন্ড মিক্সি ঘুরিয়ে সবটুকু ব্যাটার স্প্যাচুলা দিয়ে একটি বড় কাচের বাটিতে নামিয়ে একটু মিশিয়ে নিতে হবে।

৫। পছন্দমত শেপের কেক টিনে অয়েল ব্রাশ করে তাতে বাটার পেপার দিয়ে তারপর তৈরি করা ব্যাটার দিয়ে দশ মিনিট প্রিহিটেড আভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘণ্টা বেক করতে হবে। মাঝে একবার চেক করে নিয়ে সময় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সব আভেন একরকম কাজ করে না। সেক্ষেত্রে সময় এবং তাপমাত্রা দুটোই নিজেকে ঠিক করতে হবে।

৬। কেক রুম টেম্পারেচার আসলে টিন থেকে বের করে ওইভাবে খাওয়া যেতেই পারে কিন্তু যদি ওটার ওপর ক্রীম চীজ আর আখরোট কুচি দিয়ে গার্নিশিং করা যায় তাহলে হবে লা জবাব। আমি এখানে ১ কেজি দুধের ছানা আর দেড়কাপ হাং কার্ড নিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে তাতে ২ টেবিল চামচ মেপ্‌ল সিরাপ দিয়ে পেস্ট বানিয়ে ড্রেসিং করেছি। আর তার ওপর আখরোট ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছি। কেকের স্বাদে এ এক অন্য মাত্রা আনে। মেপল সিরাপ না থাকলে মধু ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোনওরকম চিনি আর ময়দা এতে ব্যবহার করা হয় নি। সম্পূর্ণ ভাবে গ্লুটেন ফ্রি আরগ্যানিক কেক এটা। কারও যদি চিনিতে আপত্তি না থাকে তাহলে এটাতে ব্রাউন সুগার বা জ্যাগারি পাউডারও ব্যবহার করা যেতে পারে পরিমাণ মত।

পাতা মিত্র

EKHON DUARS, Vol-7, Issue-5 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

রোজনামচা। তপন রায় প্রধান। ১৯৫ টাকা
তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

পঞ্চাশে ৫০। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহেলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

বিসমিল্লার সানাই চৌরাশিয়ার বাঁশি। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাল্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www.dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.